নভেম্বর ২০২৫ ■ কার্তিক – অগ্রহায়ণ ১৪৩২

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

‘নতুন কুঁড়ি ২০২৫’ -এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পুরস্কার প্রাপ্তদের সাথে প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

নভেম্বর ২০২৫ ❑ কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪৩২

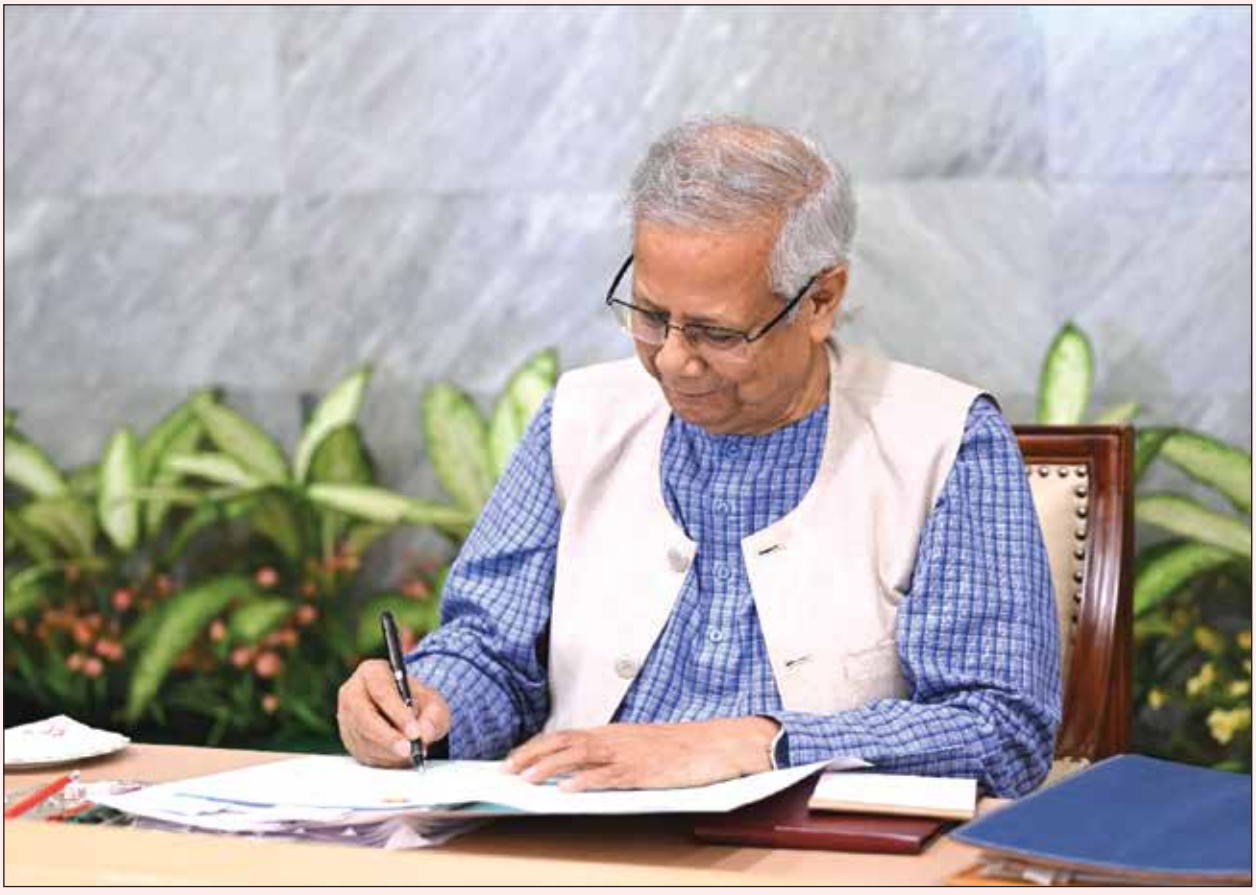

জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ ২০২৫ অনুমোদন দেয় উপদেষ্টা পরিষদ। ১৩ই নভেম্বর রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণের পূর্বে আদেশের সারসংক্ষেপে স্বাক্ষর করেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস— পিআইডি

প্রধান সম্পাদক
খালেদা বেগম

সিনিয়র সম্পাদক
শাহিদা সুলতানা

সম্পাদক
ফাহমিদা শারমীন হক

শিল্প নির্দেশক
মো. ফরিদ হোসেন

স্টাফ রাইটার
মো. জামাল উদ্দিন

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

অলংকরণ
নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

যোগাযোগঃ সম্পাদনা শাখা
ফোন: ৮৩০০৬৮৭
E-mail: dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
Website: www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয়, বিতরণ ও প্রদর্শনী)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৭০২

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

মুদ্রণে: প্রিয়াংকা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স
৭৬/ই, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০।

সম্পাদকীয়

রক্তক্ষয়ী জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর রাষ্ট্র সংস্কারের দাবি পূরণে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকার ও জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দীর্ঘ আলোচনার পর 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' স্বাক্ষরিত হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস প্রদত্ত ভাষণে বলেন, 'রাষ্ট্রকাঠামো সংস্কারের প্রস্তাব তৈরির লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন নিরলসভাবে গত প্রায় নয় মাস ধরে কাজ করেছে। এসময় কমিশন জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছে। ঐকমত্য কমিশনের প্রণীত জুলাই সনদে সংবিধান বিষয়ক ৩০টি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রস্তাবে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য তৈরি হয়েছে। এটি একটি ঐতিহাসিক অর্জন।' জুলাই বিপ্লবের পরে এক বিশেষ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে গণ-আকাঙ্ক্ষা, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বাস্তবতা ও ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনাকে ভিত্তি দিতে এ ধরনের সনদ সন্দেহাতীতভাবেই অপরিহার্য ভূমিকা পালন করবে। জুলাই সনদ নিয়ে রয়েছে একটি নিবন্ধ।

হেমন্ত আসে কৃষকের মুখে হাসি আর নবান্ন নিয়ে। ঋতুকন্যা হেমন্তের শিশির বিন্দু, গ্রামবাংলায় হেমন্তের জীবনধারা বাঙালি জীবনের এক বর্ণাঢ্য ঐতিহ্য। হেমন্তের এই রূপের আলোয় শস্য ক্ষেতের বৈভব, প্রকৃতির বৈচিত্র্য আর নবান্ন শুধু বিমোহিত করে না, অন্নও জোগায়। হেমন্ত ভরিয়ে তোলে গৃহ-ভাণ্ডার। এ নিয়ে রয়েছে নিবন্ধ।

আয়কর সংগ্রহের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তুলনামূলক বিত্তবান নাগরিকদের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করে দেশের কল্যাণ ও উন্নয়নে ব্যবহার করা। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সুবিধাভোগী প্রতিটি নাগরিক। প্রতিটি নাগরিকের দেশের উন্নয়নে অংশগ্রহণ করা আবশ্যক। স্বপ্রণোদিত আয়করই হোক আমাদের স্বনির্ভরতার ভিত্তি। এ বিষয়ে থাকছে নিবন্ধ।

আমরা চাই মানবিক বাংলাদেশ। দেশের উন্নয়ন তখনই টেকসই হয়, যখন এর ভেতর থাকে মানবিকতা। মানবিক বাংলাদেশ হবে এমন এক দেশ, যেখানে প্রতিটি মানুষ অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ থাকবে প্রতিটি নাগরিকের মাঝে।

অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ ও নিবন্ধ দিয়ে সাজানো হয়েছে এবারের সংখ্যাটি। আশা করছি, নভেম্বর সংখ্যাটি পাঠকের প্রত্যাশা পূরণ করবে।

সূচিপত্র

নিবন্ধ/ফিচার/স্বাস্থ্যকথা

বাংলাদেশের গণতন্ত্রের নতুন অভিযাত্রা হোক জুলাই সনদ ৪
আলী হাসান

ঋতু রানি হেমন্ত ৯
রহিম আব্দুর রহিম

দুবলার চরে রাস মেলা: কিংবদন্তি ও নান্দনিক সংস্কৃতি ১২
ড. সাইমন জাকারিয়া

নবান্ন উৎসব এবং বাঙালির সম্প্রীতি ১৭
ড. সবুজ শামীম আহসান

হুমায়ূন আহমেদের *নন্দিত নরকে*: বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারের ধূসর পাণ্ডুলিপি ২১
গাজী আজিজুর রহমান

জাতীয় আয়কর দিবসের গুরুত্ব ২৬
এম এ খালেক

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা: আমাদের ভবিষ্যৎ ২৯
রকিবুল ইসলাম

সংস্কৃতির শিক্ষা ৩২
অসিত কুমার মন্ডল

চাই একটি মানবিক বাংলাদেশ ৩৪
মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন

আধুনিক নারী প্রগতি আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব সুফিয়া কামাল ৩৫
তারিকুল আমিন

গ্রন্থাগার: জ্ঞানের ভাণ্ডার ৩৭
শাহানা আফরোজ

জীবনঘনিষ্ঠ সামাজিক সিনেমার জনপ্রিয় নির্মাতা কাজী জহির ৪০
আপন চৌধুরী

মিষ্টি রোগের তিক্ত বাস্তবতা ৪২
ডা. মোহাম্মদ হাসান জাফরী

রংপুর ডায়েরি: দায়িত্ব, ভ্রমণ আর স্মরণীয় স্মৃতি ৪৪
হুসাইন মামুন

নিউমোনিয়া: কারণ, উপসর্গ ও প্রতিকার ৪৭
ডা. নাজনীন নাওয়াল বিপাশা

সুস্থ মাটি ও টেকসই মৃত্তিকা: দেশ বিনির্মাণে অপরিহার্য ৪৯
মায়মুনা খন্দকার

ডায়াবেটিস: নীরব ক্ষয় ৫১
অ আ আবীর আকাশ

ডিএফপি'র বিশেষ কার্যক্রম নভেম্বর ২০২৫ ৫৩

গল্প

বিরহ বিলাপ ৫৫
জসীম আল ফাহিম

রক্তের বাঁধন ৬০
আসাদুজ্জামান খান মুকুল

কবিতা

৬২-৬৩
কামাল বারি, আবুল কালাম তালুকদার, মুহাম্মদ নূর ইসলাম, সাবরিন সুলতানা, শাহানাজ শিউলী, ফরিদ সাইদ, প্রজীৎ ঘোষ, বিপুল চন্দ্র রায়

শ্রদ্ধাঞ্জলি

চলে গেলেন ড. কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী ৬৪

প্রধান উপদেষ্টা ও জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ১৭ই অক্টোবর ২০২৫ জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন– পিআইডি

বাংলাদেশের গণতন্ত্রের নতুন অভিযাত্রা হোক জুলাই সনদ

আলী হাসান

২০২৪-এর ৫ই আগস্টের পর পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের পরবর্তী বাস্তবতায় নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের মানুষ নিজেদের গণতান্ত্রিক স্বপ্ন ও সংগ্রামের ইতিহাসকে নতুনভাবে পাওয়ার সুযোগ পেয়েছে। ছাত্র-জনতার দীর্ঘদিনের আন্দোলন-সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে বহুল আলোচিত ও সময়ের উপযোগিতার বিবেচনায় 'জুলাই সনদ' খুবই গুরুত্বের দাবি রাখে। তবে প্রথম থেকেই এটি জনমনে কিছু প্রশ্ন হিসেবে দেখা দিয়েছে। সেটা হলো, বাংলাদেশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই জুলাই সনদ কি দেশের মানুষের মুক্তির দলিল হয়ে উঠতে পারে? নতুন পথে ধাবিত অর্ধশতাধিকেরও বেশি বয়সি বাংলাদেশের জন্য এ ধরনের সনদের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু? কী রয়েছে বহুল আলোচিত কিংবা সমালোচিত এই জুলাই সনদে? উল্লিখিত প্রশ্নগুলোর জবাব পেতে হলে জুলাই বিপ্লবোত্তর বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতা, এর তত্ত্বীয় ভিত্তি এবং দেশের মানুষের ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষাগুলোকে একসাথে যুগপৎভাবে বিচার করতে হবে।

প্রথমেই আমরা দেখতে চাই মূলত 'জুলাই সনদ' বিষয়টা কী?

জুলাই সনদ হলো কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ছাত্র-জনতার মিলিত শক্তির মাধ্যমে ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য সংবিধান ও রাষ্ট্রনৈতিক বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা প্রণীত একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাপত্র– যা ২৫টি রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণে ২০২৫ সালের ১৭ই অক্টোবর স্বাক্ষরিত হয় এবং এটি একটি নতুন গণতান্ত্রিক ধারায় বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে তৈরি, যেখানে সংবিধানের মৌলিক কিছু সংস্কারের প্রস্তাব করা হয়েছে এবং এটি বাংলাদেশের নাগরিকদের দ্বারা গণভোটের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে।

জুলাই সনদের পেছনে মূল ক্রিয়াশীল হিসেবে রয়েছে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতাদর্শগত এক অভিন্ন ঐক্য– যা মূলত বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একটি সমঝোতার ফসল এবং যা দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সংস্কারের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করে। সংবিধান সংস্কারের যে বিষয়টি জুলাই সনদে ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে তা মূলত সংবিধানের বিভিন্ন ধারার সংশোধনের প্রস্তাবসমূহ। এই সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্য হবে দেশে একটি স্থিতিশীল ও সকলের অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। জুলাই সনদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এই প্রক্রিয়ায় একটি 'জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ ২০২৫' জারি করা হয়েছে– যা একটি গণভোটের মাধ্যমে জনগণের সম্মতি গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করবে। উল্লেখ্য, এই গণভোট অনুষ্ঠিত হবে চলতি বছরের ১২ই ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন একই সময়ে। জুলাই সনদ বাস্তবায়নের মূল উদ্দেশ্য কী তা যদি এক কথায় বলতে হয় তাহলে বলতে হবে– আওয়ামী লীগ সরকারের গত ১৬ বছরের রাজনৈতিক সহিংসতা ও জনমনে অস্থিতিশীলতার অবসান ঘটিয়ে আইনের শাসন, ন্যায়বিচার ও সমৃদ্ধির পথে বাংলাদেশকে এক নতুন মাত্রায় এগিয়ে নেওয়া এবং ১৯৭২ সালের সংবিধানের মূল চেতনাকে ফিরিয়ে আনা।

সন্দেহ নেই, এই জুলাই সনদ অর্ধশতকেরও বেশি বয়সি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, যা এদেশের মানুষের জন্য একটি নতুন রাজনৈতিক অধ্যায়ের সূচনা করতে যাচ্ছে। চলতি বছরের ১২ই ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠাতব্য আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশের রাজনৈতিক দলগুলো ইতোমধ্যেই তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে এই জুলাই সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারের কথাও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উচ্চারণ করছে।

পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে জুলাই সনদ নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দলের সম্মিলিত একটি রাজনৈতিক চুক্তি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। জুলাই বিপ্লবের পরে এক বিশেষ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে গণ-আকাঙ্ক্ষা, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বাস্তবতা ও ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনাকে ভিত্তি দিতে এ ধরনের সনদ সন্দেহাতীতভাবেই অপরিহার্য ভূমিকা পালন করবে। দেখা গেছে, বিশ্বজুড়েই বিভিন্ন দেশে যুগে যুগে জুলাই আন্দোলন ও তার পূর্বাপরের মতো এ ধরনের স্বৈরাচারী সংঘাতময় রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও প্রগতিবিরুদ্ধ জনবিশৃঙ্খলা মোকাবিলা করতে এবং দেশের ভেতরে শান্তিপূর্ণ ও প্রগতিশীল ভারসাম্যমূলক জনবান্ধব পরিবেশ-পরিস্থিতি নির্মাণে 'ম্যাগনা কার্টা' সনদ ও 'জাতিসংঘ' সনদের মতো তাৎক্ষণিক বিবেচনাপ্রসূত বহু সনদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। দেশে দেশে উদ্ভূত পরিস্থিতি ও গভীর

প্রধান উপদেষ্টা ও জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ১৭ই অক্টোবর ২০২৫ জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষর করেন– পিআইডি

প্রধান উপদেষ্টা ও জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ১৭ই অক্টোবর ২০২৫ জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষর শেষে জনগণের উদ্দেশ্যে তুলে ধরেন– পিআইডি

সংকটময় মুহূর্তে যখন রাষ্ট্রের নাগরিকগণের পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, আইনের শাসনের প্রতিষ্ঠা এবং ভবিষ্যতের মানবসম্পদ গঠনের জন্য সম্মিলিত ভিত্তি তৈরি করার প্রয়োজন পড়েছে, তখনই এ ধরনের সনদের অপরিহার্যতা সামনে চলে এসেছে।

প্রসঙ্গক্রমেই এখানে উল্লেখ্য যে, ২০০৯ সালে সাধারণ জাতীয় নির্বাচনোত্তর আওয়ামী লীগ সরকার রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে; কিন্তু দেখা যায় ক্রমান্বয়ে তারা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে অগণতান্ত্রিক চরিত্র ধারণ করতে মরিয়া হয়ে ওঠে। একের পর এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা, স্থানীয় সরকার নির্বাচনসহ সাধারণ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং আইনের শাসনের প্রতি তারা থোরাই কেয়ার করতে থাকে। সবকিছুতে চলতে থাকে নির্লজ্জ দলীয়করণ ও অবাধ দুর্নীতি। এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগ সরকার তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সমালোচকদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার হরণ, গুম, খুন, নিপীড়ন-নির্যাতন, মামলা ও হামলার মাধ্যমে একটি চরম নৈরাজ্যকর ও বিভীষিকাময় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। তারা সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্বৈরতান্ত্রিকভাবে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বন্দনার ভাগাড়ে পরিণত করে। তখন দেখা যায়, দীর্ঘ দেড় দশক ধরে স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার জনস্বার্থের বিরুদ্ধে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার ও বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন, সাধারণ নির্বাচনি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা, ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত দলীয় প্রতীক কুক্ষিগতকরণ, বিভাগ ও জনপ্রশাসনকে দলীয়করণ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদের ব্যাপক লুটপাট করে। এরই প্রেক্ষাপটে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে প্রথমে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন এবং এরপর ব্যাপকসংখ্যক ছাত্র হত্যা ও পুলিশি নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিপুল ছাত্র-জনতার অংশগ্রহণের ফলে এক অভূতপূর্ব সফল গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। ৩৬ দিন ব্যাপী দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিহিংসার শিকার হয়ে শিশু ও নারীসহ এক হাজার চারশ'র বেশি নিরস্ত্র নাগরিক নিহত এবং বিশ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়। তাদের আত্মাহুতি ও ত্যাগের বিনিময়ে এবং জনগণের সম্মিলিত শক্তি ও প্রতিরোধের কাছে স্বৈরাচারী শাসক ও তার দোসররা এক পর্যায়ে পরাজিত হয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

এমতাবস্থায় পরিবর্তিত রাজনৈতিক পটভূমিতে জনগণের মননে রাষ্ট্র-কাঠামো পুনর্গঠনের একটি প্রবল অভিপ্রায় সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্র সংস্কার– বিশেষ করে সংবিধানের মৌলিক সংস্কার, নির্বাচনি ব্যবস্থার পুনর্গঠন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুশীলন, স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং আইনের শাসনসহ জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়। এরই পটভূমিকায় প্রয়োজন দেখা দেয় সংবিধান সংশোধনসহ

রাষ্ট্রের বিভিন্ন অত্যাবশ্যকীয় দিকগুলোর প্রয়োজনীয় সংস্কারের। জুলাই সনদ সেই অপরিহার্য সংস্কারগুলোরই মূলত সমন্বিত রূপ।

বাংলাদেশে আওয়ামী ফ্যাসিবাদী সরকারের সাথে শুরু হওয়া সংঘাতময় পরিস্থিতি যে মৌলিক সমস্যাগুলো থেকে সৃষ্টি হয়েছে তা এখনো সম্পূর্ণভাবে নিরসন হয়নি। উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে সৃষ্ট মৌলিক সমস্যাগুলো নিরসন করতে বিশেষজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এখন মুখোমুখি অবস্থানে আছে বলা যায়। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনোত্তর একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সরকারের ক্ষমতাগ্রহণ না করা পর্যন্ত নীতিগতভাবেই দেশ একটা অনিশ্চয়তার পথে রয়েছে– এ কথা স্বীকার করতেই হবে। ফলে বিগত সরকারের ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থাসহ বর্তমানের সার্বিক পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য জুলাই সনদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে নিশ্চয়ই।

মনে রাখতে হবে, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট এমনি-এমনিই তৈরি হয়নি। দীর্ঘ দেড় দশক ধরে ভোটাধিকার ও আইনের শাসন বঞ্চিত হয়েছে দেশের আপামর সাধারণ মানুষ। ধাপে ধাপে বিভিন্ন সময় দেশের রাজনৈতিক দলগুলো সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রামও করেছে বটে কিন্তু সরকার পতনের দ্বারপ্রান্তে তারা পৌঁছাতে পারেনি। এছাড়া আইনি পথে কাঠামোবদ্ধ আওয়ামী ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোরও কোনো পথ না থাকায় এক পর্যায়ে দেশের আপামর ছাত্র-জনতা সম্মিলিতভাবে গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকারকে উৎখাত করতে এক দফা আন্দোলনে মাঠে নামে। এটা ইতিহাসপাঠে আগ্রহীজন, আন্দোলনকারী বিপুলসংখ্যক ছাত্র-জনতা এবং সাধারণ মানুষসহ সকলের জন্যই চরম শিক্ষণীয় যে, কোটাবিরোধী একটি সাধারণ ও নিরীহ আন্দোলন কী করে রাষ্ট্রযন্ত্রের একঘেয়েমি ও স্বৈরাচারী মনোভাবের কারণে তা সরকার পতনের চূড়ান্ত আন্দোলনে রূপ নিতে পারে। আন্দোলনকালীন দেশজুড়ে রাস্তায় রাস্তায় ছাত্র-জনতা স্লোগান দিয়ে, দেয়ালে দেয়ালে প্রতিবাদের গ্রাফিতি এঁকে, সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারের মাধ্যমে তাদের প্রতিবাদের ভাষা অত্যন্ত জোরালো করে তোলে। দেয়ালে দেয়ালে এমন প্রতিবাদের কাব্যিক গ্রাফিতি এর আগে কেউ কখনো দেখেনি বাংলাদেশের কোনো আন্দোলন-সংগ্রামের ইতিহাসে। ছাত্র-জনতার মিলিত আন্দোলনের এই বিশেষ ঐতিহাসিক সময়ের দৃষ্টান্ত এবং দেশের মানুষের সম্মিলিত প্রতিরোধের এই ঘটনাকে তুলে ধরতে এবং তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তব প্রতিফলন ধারণ করে পরবর্তী কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করার জন্য এই জুলাই সনদের প্রয়োজনীতাকে কোনোভাবেই খাটো করবার ফুরসত নেই। তবে জুলাই সনদ প্রণয়ন করাটাই মূল কথা নয়– বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর যুগোপযোগী বাস্তবায়নই আসল ব্যাপার। জুলাই সনদ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্টদের দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতার প্রশ্নকে কোনোভাবেই এড়িয়ে যাওয়ারও সুযোগ নেই। আওয়ামী ফ্যাসিবাদী সরকারের পতনের পর একটি সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য ও অবাধ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে কারা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবে– তাদের ওপরই অনেককিছু নির্ভর করবে। ছাত্র-জনতার স্লোগানে, দেয়ালে-দেয়ালে সেঁটে থাকা গ্রাফিতিতে, সোশ্যাল মিডিয়ার প্রচারে ছাত্র-জনতার কী কী আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছিল তা বিস্মরণ হবার কোনো সুযোগ নেই। ছাত্র-জনতার সেই আকাঙ্ক্ষার আলোকেই সাধারণ সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে নবগঠিত সরকার কীভাবে জুলাই সনদের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংস্কারগুলোর বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে এবং বাংলাদেশের আপামর নাগরিকগণের প্রতি নবগঠিত সরকার কতটুকু দায়বদ্ধ থাকবে তার ওপরও তা নির্ভর করবে নিশ্চয়ই। মূলত বলবার বিষয় হচ্ছে– ছাত্র-জনতা ও দেশের সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর থাকতে হবে জুলাই সনদে। এই জুলাই সনদ জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ও নির্ভরযোগ্য ধারণা যেন গড়ে তোলে সেটাও স্পষ্ট করতে হবে তাদের। আমাদের সকলের জানা যে, গণতন্ত্র চর্চায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সকলের

প্রধান উপদেষ্টা ও জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের উপস্থিতিতে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিরা ১৭ই অক্টোবর ২০২৫ জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষর করেন– পিআইডি

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ৫ই আগস্ট ২০২৫ ঢাকায় জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় জুলাই ঘোষণাপত্র পাঠ অনুষ্ঠানে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহিদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন– পিআইডি

অংশগ্রহণ, যথাযথ দায়িত্বপালন এবং স্বচ্ছতা আনয়ন– এই তিনটি বিষয় যতটা নির্ভুল, ন্যায়ভিত্তিক ও ক্রিস্টাল ক্লিয়ার থাকবে, জুলাই সনদের মর্যাদা ও বাস্তবায়ন ততটাই স্থায়ী, উজ্জ্বল ও গ্রহণযোগ্য হবে সকলে কাছে।

সন্দেহাতীতভাবেই সকলে আশা করছে, জনবান্ধব রাষ্ট্রীয় সংস্কারের নীতির ভিত্তিতে তৈরি জুলাই সনদ হবে আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতার রাজনৈতিক পরিচয় ও জনগণের ক্ষমতা প্রয়োগের একটি আইনগত স্বীকৃত নীতিপদ্ধতি। সকলেই চায়, আওয়ামী ফ্যাসিবাদবিরোধী যে রাজনৈতিক দলগুলো এই সনদে স্বাক্ষর করেছে, সেই স্বাক্ষরের মাধ্যমে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়ে তারা যেন বলতে পারে, জুলাই আন্দোলনের প্রেক্ষাপট কতটা মাহাত্ম্য ও তাৎপর্যপূর্ণ ছিল– কীভাবে ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়েছে এবং ভবিষ্যতে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে নবগঠিত রাষ্ট্র পরিচালনার রূপরেখা কী রকম হবে। এসব প্রশ্নের দায়িত্বশীল সমাধানের মধ্যে দিয়েই জুলাই সনদ হয়ে উঠতে পারে ফ্যাসিবাদবিরোধী সকল পক্ষের মধ্যকার একটি আশাজাগানিয়া কার্যকর চুক্তি। এটা হলেই জুলাই সনদ হবে গণ-অভ্যুত্থানের আইনি ভিত্তি দেওয়া এক কালজয়ী জনদলিল। সেটা হলে এবং জুলাই সনদ তার নির্দিষ্ট পথ ধরে নিয়মমতো এগুলে অহেতুক জনমনে বিতর্কিত নীতি থেকে বেরিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আত্মপরিচয়ের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অভ্যুত্থান পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের ভিত্তি হবে অত্যন্ত মজবুত। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আওয়ামী ফ্যাসিবাদবিরোধী অভ্যুত্থান পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের আইনগত ভিত্তি রচনা করাই হবে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জোরালো ভিত্তি।

স্মর্তব্য যে, অভ্যুত্থান পরবর্তী ছাত্র-জনতা মিলে অন্তত একটি প্রতীকী নেতৃত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতি। বলার অপেক্ষা রাখে না, আন্দোলনের একটি পর্যায়ে আওয়ামী ফ্যাসিবাদবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো সংগঠিতভাবেই সরকার পতনে অংশ নিয়েছিল। এছাড়াও রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ছিল সিভিল সোসাইটি, চাকরিজীবী, পেশাজীবী, অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক, শ্রমিকসহ নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ। এরা সকলেই এই অভ্যুত্থানের একান্ত অংশীজন। সুতরাং জুলাই সনদ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে এদের সকলের অংশগ্রহণ স্বীকার করে নিতে হবে সম্পূর্ণ দ্বিধাহীন চিত্তে। সকলের অংশগ্রহণ শর্তহীনভাবে স্বীকার না করলে এই গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের জন্য জুলাই সনদের রূপরেখা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার কোনোভাবেই ফলপ্রসূ হবে না।

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন একইসঙ্গে যে গণভোট অনুষ্ঠিত হবে সে প্রসঙ্গে বলা যায় যে– বিশ্বের নানা দেশে প্রতিনিয়ত গণভোট হয় বা হচ্ছে এবং গণভোট সেখানে জনগণের গাঠনিক ক্ষমতার গণতান্ত্রিক প্রকাশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যখন পুরোনো ক্ষমতার কাঠামো ভেঙে জনগণ নিজে গঠনের প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে অবস্থান করে তখন স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে জনগণের সে অংশগ্রহণ বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার নিশ্চয়ই। এখানে গণভোটকে কোনোভাবেই জনগণের শুধুমাত্র ব্যালট পেপারে 'টিক' মারার যন্ত্রে পরিণত করা সংগত নয়। গাঠনিক ক্ষমতায় জনগণ যেন নিজস্ব রাজনৈতিক মতাদর্শকে বিশেষ গুরুত্বে বিবেচনা করতে সক্ষম হয়। বলার বিষয়– জুলাই সনদ-২০২৫ ও তার বাস্তবায়ন আদেশ যেন জনগণের সামনে একটি ঐতিহাসিক বিভাজনরেখা তৈরি না করে ফেলে। পতিত ফ্যাসিস্ট সরকারের সংবিধান ও তাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার ধারাবাহিকতা যেন আসন্ন গণভোটের ভাষার একই কণ্ঠস্বর না হয়ে ওঠে। মনে রাখতে হবে, জুলাই গণ-অভ্যুত্থান থেকে জন্ম নেওয়া জনগণের গাঠনিক ক্ষমতার পুরোপুরি বিকাশকে সংগঠিত করতে পারলেই কেবল জুলাই আন্দোলনের উদ্দেশ্য যথাযথ ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং জুলাই অভ্যুত্থানের শহিদদের প্রতি সত্যিকারের শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিত হবে।

আলী হাসান: লেখক ও সাংবাদিক

ঋতু রানি হেমন্ত

রহিম আব্দুর রহিম

অভূতপূর্ব সৌন্দর্যের বাংলার ঋতুচক্র অনিন্দ্য সাজে আমাদের মাঝে ঘুরে ফিরে উপস্থিত হয়। বারো মাসে ছয় ঋতু। প্রতিটি ঋতুর আগমনে বাংলা মায়ের রূপ বৈচিত্র্যের পরতে পরতে দোলা দেয় রূপ রসের ব্যঞ্জনা। প্রচণ্ড রৌদ্রের প্রখরতায় নদী-নালা, খাল-বিল পরিপূর্ণ করে বিদায় নেয় বর্ষাকাল। কাশবনের থোকা থোকা প্রকৃতির মাঝে উজ্জীবিত হয়ে ফুটে ওঠে শরৎকাল। ষড়ঋতুর বাংলাদেশে চতুর্থ ঋতু হেমন্ত আসে প্রকৃতির রানি সেজে। ব্যঞ্জনাময় বাংলার হেমন্ত এক অনিন্দন ঋতু। শরৎ শেষে যখন প্রকৃতি কিছুটা মলিন হতে থাকে, ঠিক ওই সময় রানি হেমন্ত আমাদের দোরগড়ায় উপস্থিত হয় তার নিজস্ব আদলে। আগাম পড়তে শুরু করে শীতের হিম কুয়াশা। মাঝে মাঝে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি, হালকা ছাই রঙের কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়ে প্রকৃতির ভোর বিহান এবং সান্ধ্যকালীন সুনীল আকাশ। ফসলহীন মাঠ যেন পরিত্যক্ত জনপথ। যার উল্টো পিঠে কৃষকের ঘরে আনন্দের বন্যা। মাঠ শূন্য করে তারা ফসলের গোলা ভরছে তো ভরছেই, মিটাচ্ছে অভাব। ঘরে ঘরে শুরু হয় নবান্ন। সেই সুদীর্ঘ কাল থেকেই হেমন্ত আমাদের প্রাণের উৎসবে যৌবনাময় এক জীবন্ত ঋতু। কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের সমন্বয়ে গঠিত হেমন্ত ঋতুতেই এক সময় বাংলার নববর্ষ শুরু হতো। কারণ, ধান উৎপাদনের ঋতুই হলো এই হেমন্ত। বর্ষার শেষ দিকে বোনা আমন-আউশ শরতে বেড়ে উঠে। আর হেমন্তের প্রথম মাস কার্তিকেই ধান পরিপক্ব হয়। এই ঋতুতে ফুটে গন্ধরাজ, মল্লিকা, শিউলি, কামিনী, হিমঝুড়ি, দেবকাঞ্জন, রাজঅশোক, ছাতিম ও বকফুল। অলস সময় কাটায় কৃষান-কৃষানিরা। কবি নজরুল ইসলামের কবিতায় হেমন্ত বন্দনায় উঠে আসে– ঋতুর খাঞ্চা ভরিয়া এলো একি ধরণীর সওগাত?/নবীন ধানের অঘ্রাণে আজি অঘ্রাণ হলো মাত/'গিন্নি পাগল' চালের ফিরনি/তশতরি ভরে নবীনা গিন্নি হাসিতে হাসিতে দিতেছে স্বামীরে, খুশিতে কাঁপিছে হাত/শিরণী রাঁধেন বড়ো বিবি, বাড়ি গন্ধে তেলেসমাত!/মিয়াঁ ও বিবিতে বড়ো ভাব আজি খামারে ধরে না ধান/বিছানা করিতে ছোট বিবি রাতে চাপা সুরে গাহে গান!/শাশবিবি কন, 'আহা আসে নাই কতদিন হলো মেজলা জামাই' ছোট মেয়ে কয়, 'আম্মাগো রোজ কাঁদে মেঝো বুবুজান' দলিজের পান সাজিয়া সাজিয়া সেজো বিবি লবে যান। কবির এই কবিতায় হেমন্ত চিত্রের স্পষ্টতা প্রকাশ পেয়েছে।

সব মিলে হেমন্তের ফসল কাটাকেই কেন্দ্র করেই বাঙালির সর্বজনীন উৎসব সূচনা ঘটে। যা বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশে 'শস্যোৎসব' নামেই চিরপরিচিত। নতুন আমন কাটার পর পরই সে উৎসব-উল্লাস আমাদের মাঝে উপচে পড়ে। কোনো কোনো অঞ্চলে নতুন ফসলের প্রথম রান্না ফিরনি-পায়েস অথবা ক্ষীর তৈয়ার করে আত্মীয়স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীদের ঘরে ঘরে বিতরণ করা হয়। কোনো কোনো অঞ্চলে মেয়ের জামাই নাতি-পুতিদের নিমন্ত্রণ করে আপ্যায়ন করে। এই সময়ে মেয়েরা তার বাপের বাড়ি নাইয়র আসার অনুপম সুযোগ পায়। শুধু কি তাই! গ্রামে গ্রামে পালা গানের হিড়িক পড়ে। নদীর তীরে বটের ছায়ায় আবহমান বাংলার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান জারি-সারি, পালাগান, নেটোর গান, ধামেরগানসহ লাঠিখেলা, বাউলগান, ঘোড়ার দৌড়, নাগরদোলায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠে সাংস্কৃতিক অঙ্গন। রূপসি বাংলার কবি জীবনানন্দ দাস, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুরের কবিতায় হেমন্তের অপরূপ সৌন্দর্যের প্রতিচ্ছবি প্রস্ফুটিত হয়। বিশ্বখ্যাত চিত্র শিল্পী এস.এম সুলতান তাঁর আঁকা অসংখ্য ছবিতে বাংলার হেমন্তের মমতাময়ী চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। হেমন্তকালে খাল-বিল, নদী-নালায় তেমন পানি থাকে না। কাদা মাখানো প্রকৃতির মাঝে মিলে কৈ, পুঁটি, শিং, মাগুর, পোয়া, গোচি, বোয়াল, বাইন, টাকিসহ অসংখ্য জাতের সুস্বাদু মাছ। হেমন্তের গ্রামবাংলা আঁকাবাঁকা পথের ধারে নদীর তীরে কিংবা নয়নঝুলির ধারে অসংখ্য খেজুর গাছের সারিতে প্রকৃতির অনন্য রূপায়ণ ঘটে। গাছে গাছে বাঁধা থাকে হাঁড়ি। সংগৃহীত হয় খেজুরের রস। নাতিশীতোষ্ণ সকালে খেজুর রসের পায়েসে মেতে উঠে রন্ধনশালা। গাছের ডালে ডালে ঝুলন্ত বাবুই পাখির বাসা দোল খায়। বিকালের খেলার মাঠ বন্ধুত্বে মহাবন্ধনে সৃষ্টি হয় অসাম্প্রদায়িকতার সুশীতল সম্পর্কের। বাঁশ ঝাড়ে পাখির কলতান, সন্ধ্যার সূর্যালোক কিংবা ভোরের হালকা কুয়াশায় প্রকৃতি যেন মনপ্রাণ জীবন-যৌবনকে এক মুগ্ধতায় পৌঁছে দেয়। অভাব আর অলস সময়ের ব্যস্ততায় কৃষান-কৃষানির পদচারণায় ফসলের মাঠ এবং বাড়ির আঙিনা মুখরিত হয়ে উঠে। রবীন্দ্রনাথ হেমন্ত নিয়ে লেখেন– হায় হেমন্ত লক্ষ্মী, তোমার নয়ন কেন ঢাকা হিমের ঘন ঘোমটাখানি ধুমল রঙে আঁকা-সন্ধ্যাপ্রদীপ তোমার হাতে মলিন হেরি কুয়াশাতে,/কণ্ঠে তোমার বাণী যেন করুণ বাষ্পে মাখা/... আপন দানের আড়ালেতে রইলে কেন আসন পেতে/আপনাকে এই কেমন তোমার গোপন করে রাখা।

রূপসি হেমন্ত ধূসর কুয়াশায় নয়ন ঢেকে ফসল ফলাবার নিঃসঙ্গ সাধনায় নিমগ্ন থাকে। ক্ষেতে-খামারে রাশি রাশি ভারা ভারা সোনার ধান উঠতে থাকে। চারদিকে অন্তহীন কর্মব্যস্ততা। আজও তিস্তা-করতোয়া থেকে শুরু করে পদ্মা-যমুনার তীরে তীরে যেসব সোনালি ফসল সোনা ছড়ায় সেও তো হেমন্তেরই দিনে। নবান্নের উৎসব হয়। প্রাচুর্যময়ী হেমন্তের ফুলের বাহার নেই, সৌন্দর্যের জৌলুস নেই, রূপ-সজ্জারও নেই প্রাচুর্য; আছে মমতাময়ী নারীর এক অনির্বচনীয় কল্যাণী রূপশ্রী। সে আমাদের ঘর সোনার ধানে ভরে দিয়ে শিশিরের মতো নিঃশব্দ চরণে বিদায় গ্রহণ করে। অলক্ষ্যে চেয়ে চেয়ে দেখে আর প্রতীক্ষায় থাকে কখন শীত আসবে।

হেমন্ত শরতের পরিণতি আর শীতের পথ-প্রদর্শক। হেমন্তে ঘরে ঘরে সোনার ফসল ওঠে। ধানভানার গান ভেসে বেড়ায় বাতাসে, ঢেঁকির তালে মুখরিত হয় বাড়ির আঙিনা। নবান্ন আর পিঠে-পুলির উৎসবের আনন্দে মাতোয়ারা হয় সবাই। হেমন্তের 'নাইয়র উৎসবে নতুন ধানের চালের গুঁড়ি আর গুড় দিয়ে গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে তৈরি হয় নানারকমের পিঠা–পায়েস। মাটির সরাতে, বেতের থালে, কলাপাতায় অথবা পিতলের প্লেটে সাজানো থাকে গ্রামবাংলার বাহারি রকমের পিঠা– পাকান, ভাপা, চিতই, পাটিসাপটা, নকশি, পাতা, জামাই, কাটা, চুটকি, মুঠা, চ্যাপা, জামদানি, হাঁড়ি, ঝুড়ি, ফুলঝুরি, বিবিখানা, মাছ, হৃদয়, গোলাপ ফুল, পেঁচানো ফুল, শাহী বিবিখানা ইত্যাদি আরো অসংখ্য নামের পিঠা। মা-বোন, বউ-ঝিদের পিঠাশৈলী আর রাতদিনের অক্লান্ত পরিশ্রম সকলের স্বাদ, তৃপ্তি আর স্বস্তির মধ্যদিয়ে পিঠা শিল্পের পরিশ্রম সার্থক হয়। জামাইয়ের সাথে শালা-শালি, বিয়াইয়ের সাথে বিয়াইনরা মেতে উঠে গ্রামবাংলার মুখে মুখে প্রচলিত 'ধাঁধা মিলাও-পিঠা খাও উৎসবে'। এসব পিঠা নিয়েও গ্রামবাংলায় আছে নানারকমের মুখরোচক কাহিনি। অকল্যাণ থেকে রক্ষার জন্য সনাতন হিন্দুরা দেবতা সূর্যকে, কোথাও গুরু দেবতাকে আগে পিঠা দিয়ে, মেয়ের জামাইকে (দেবতা রূপে) কলাপাতায় বা বেতের থালাতে পিঠা পরিবেশন করত। বউ-জামাইয়ের আলাদা থালার সাথে পাড়ার সবাই একসাথে পিঠা খেতে বসত। তবে সনাতন হিন্দু মতে, আগে জামাইয়ের খাওয়া শেষ হবে, তারপর ঘরের বউ-ঝিরা খেতে বসবে। অতিথিকে দেবতাতুল্য জ্ঞানে সেবা করা শুধু সনাতন ধর্মেরই না, সকলেরই ছিল নিয়ম ও বিশ্বাস।

নাগরিক সভ্যতার জাঁতাকলে আবহমান কালের সংস্কৃতির অনেকটাই হারিয়ে গেলেও তার রেশ এখনো প্রজ্জ্বলিত, উদ্ভাসিত। একান্নবর্তী পরিবার প্রথায় মানুষের বন্ধন এক সময় দৃঢ় ছিল। উৎসব মুখর সমাজে সবাইকে সবার প্রয়োজন হতো। মানুষে মানুষে সম্পর্ক ছিল সহজসরল। ভাইয়ে-ভাইয়ে, বোনে-বোনে সম্পর্ক ছিল আত্মার বন্ধনে। আজ তাতে কিছুটা শিথিল হয়ে যাচ্ছে বলে অনেকেই মনে করে। অন্য ধর্মের কথা না হয় বাদই দিলাম, সনাতন হিন্দু জাতিদের অনেকেই জানে না হাজার বছরের শক্ত বন্ধনের এই ছোটো ছোটো উৎসবের কথা– যা মিথ হোক আর গল্প-কাহিনি হোক, মানুষের শাশ্বত প্রেম-প্রীতি ভালোবাসাকে বিনা সুতার মালায় হাজার বছর ধরে বেঁধে রেখেছিল– যা এখন শিথিল হয়ে হিংসা-বিদ্বেষের রূপ ধারণ করছে বলেই বাস্তবতায় পরিলক্ষিত।

সকালের সোনালি রোদে সোনালি ধান ঝলমল করে হেসে ওঠে। ধূসর বর্ণের হেমন্তে তাই আছে পরিপূর্ণতা, রিক্ততার লেশমাত্র তাতে নেই। আর এই দান কুয়াশা আর বিষণ্নতার পোশাক পরা শান্ত সৌম্য হেমন্তের।

হেমন্তের ম্লান পাণ্ডুর বিষণ্নতাকে কেউই যেন মনে রাখতে চায় না। কালিদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সবার কাব্যেই বর্ষা ধরা দিয়েছে বেশি। কেবল জীবনানন্দ দাশের কাব্যেই হেমন্ত পেয়েছে শীর্ষস্থান। কবি লিখেছেন:

> অঘ্রান এসেছে আজ পৃথিবীর বনে;
> সে সবের ঢের আগে আমাদের দু'জনের মনে
> হেমন্ত এসেছে তবু।

হেমন্তের উচ্ছ্বাস নেই, চপলতা নেই। সে যতটা পারে কেবল দিয়েই যায়। ধরিত্রীর অন্তরঙ্গ সহচরী হেমন্তের তাই নিজের জন্য কোনো প্রত্যাশা নেই। দানেই তার আনন্দ।

হেমন্ত-শীতকালে বিয়ের উৎসব বেশি হতো। অনুকূল প্রকৃতি,

ফসল, সময় সব কিছু মিলিয়ে মনে করা হতো, প্রজাপতি দেবতা এই সময়টাকে বেশি পছন্দ করেন। মানুষের বিশ্বাস, এই সময়ে বিয়ে হলে সংসার সুখের হবে।

দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কার্তিকপূজা, কালীপূজা, দীপাবলীপূজা, অমাবস্যার প্রথম বা দ্বিতীয় তিথিতে মুখের দুই পাশে দুই রঙের অবয়বে হরিপরমেশ্বর পূজা, পূর্ণিমাতে রাধা-কৃষ্ণের জন্য কীর্তন সহকারে রাসলীলা পূজা, বনের অধিবাসীর জন্য বনদেবীর পূজার্চনার মাধ্যমে বিপদ-আপদ-মঙ্গল কামনায় শরৎ-হেমন্তের গ্রামবাংলার শাশ্বত সাংস্কৃতিক রূপের সাথে অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে যোগ হয় নানান পাগলের মেলা, পীর-মুরশিদের ওরস, ওয়াজ মাহফিল। এ সময়ে ফসলে ফসলে ছড়িয়ে থাকে মাঠ-ঘাট-পথ-আঙিনা-ঘর-গোলা। মুসলমানরা প্রথম ফসল দিয়ে মাজার, দরগায় শিন্নি দেয়; কেউবা কোনো কিছু পাবার আশায়, কারো রোগ মুক্তি কিংবা মঙ্গল কামনায় পির-মুর্শিদের জন্য প্রথম ফসল মানত করে রাখে। মানুষের দ্বারে দ্বারে ভাগ্যলক্ষ্মী কার্তিক-অগ্রহায়ণের কাঁধে চড়ে ঘুরে বেড়ায়, মাঠ-ঘাট শস্যশ্যামলায় ভরে দেয়। আর তাইতো, সনাতন জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য ধর্ম জাতির মধ্যে অসীম রহস্যের প্রতি কৃতজ্ঞতায় নিজেদের তৈরি বিশ্বাসের মিথগুলোকে গড়ে তোলে নিজেদের মতো করে, পরিবর্তনও করে নিজেদের সুবিধা মতো।

হেমন্তের নবান্নের সময় প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন-মানসিকতায়ও পরিবর্তন আসে। ধানের হরিদ্রা রঙের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মেয়ে ও বধূরা হলুদ শাড়ি সায়াহ্নের রক্তিম সূর্যের কিরণে যেন, পায়ের আলতা রং শাড়ির পাড়ে উঠে আসে; সেই সাথে ছেলেরাও যেন অঘ্রাণের পাকা হলুদ ধানের আভা ধারণ করে তাদের ফতুয়া ও পাঞ্জাবিতে। তাদের ফতুয়া ও পাঞ্জাবির নকশায় আবহমান বাংলার প্রতিচ্ছবিও ফুটে ওঠে। এ সময় গ্রামবাংলার পাড়া-মহল্লায় বিয়ের ধুম পড়ে যায়। পাকা ধান কিবা নানান শস্যের বিনিময়ে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে কন্যাকে পিতা পাত্রস্থ করেন। বিয়ে বাড়িতে বিয়ের গীত আর আলতা-মেহেদিতে রাঙানোর আসর বসে। মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত, এ সময়ে বিবাহ নাকি নতুন সংসারে সুখ ও শান্তি বয়ে আনে। প্রকৃতির সবুজ ফসল হরিদ্রাভ সাজে নতুনের জাগরণ ঘোষণা করে। শরতের গিরা জল সরে গিয়ে মাঠ-ঘাট ভরে ওঠে সোঁদামাটির গন্ধে। সূর্যের রক্তিম আভা নদীর শান্ত জল আর ভোরের ফসলের কচি ডগায় জমে থাকা শিশির পড়ে ঝিকমিক করে, মধুমাখা শীতল বাতাস অঙ্গজুড়ে হিল্লোলিত হয়। ঘরে ঘরে নতুন ধানের চালে শুরু হয় উৎসব। ভোর রাতে বাড়ি বাড়ি ঢেঁকিতে চালের গুড়ি কোটা, চিড়া কোটার শব্দ উঠত– এখন যা অজপাড়া গ্রাম ছাড়া চোখে পড়ে না। এভাবে শরতে-হেমন্তে বাংলার প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন রূপ নেয়। শরৎ যদি হয় উচ্ছলতার ও আনন্দের, হেমন্ত তবে বিষণ্নতার। দু'জনেই সাধ্যমতো উপহার দেয়। শরৎ সাজায় প্রকৃতিকে, হেমন্ত ভরিয়ে তোলে গৃহ-ভাণ্ডার। একজনের দানের আভাস বড়ো বেশি স্পষ্ট। সেখানে উজ্জ্বলতা আছে, আছে উচ্ছলতা। অন্যজন ভরিয়ে তোলে গৃহকোণ। প্রকৃতি তখন ধূসর, মলিন। এ ঋতু চক্রের মহিমায় বাংলাদেশ চিরকাল অপূর্ব সুখ, সৌন্দর্য ও শান্তির নিকেতন। তাই তো কবি বার বার গেয়ে উঠেন–

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।

রহিম আব্দুর রহিম: প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, গবেষক ও সহকারী অধ্যাপক (অব.), গলেহা হাট ফাজিল মাদ্রাসা, পঞ্চগড়, bskt1967@gmail.com

দুবলার চরে রাস মেলা: কিংবদন্তি ও নান্দনিক সংস্কৃতি

ড. সাইমন জাকারিয়া

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন সুন্দরবনকে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা ইউনেস্কো ৬ই ডিসেম্বর ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রাণী বৈচিত্র্যের জন্য বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। সেই সুন্দরবনের অভ্যন্তরে শীতকালে জেগে ওঠা দুবলার চরে প্রতিবছর কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে সর্বধর্ম ও সর্বপ্রাণীর মিলনের আকাঙ্ক্ষায় রাস মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

ঐতিহাসিক সূত্র থেকে জানা যায়, ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের সূক্ষ্ম-সনাতন ধর্মের অনুসারী পাগল হরিভজন সুন্দরবনের অভ্যন্তরে এই রাস মেলার প্রবর্তন করেন। কথিত আছে যে, মতুয়া ধর্মের প্রবর্তক হরিচাঁদ ঠাকুরের শিষ্য পাগল হরিভজন আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি বহু স্থানে নিজের মাহাত্ম্য প্রকাশের পর ১৩৩০ বঙ্গাব্দে (১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে) রাসযাত্রার দিনে সুন্দরবনের দুবলার চরে উপনীত হন। সে সময় তিনি তাঁর সঙ্গে আসা বারো জন ভক্তকে রাস মেলা আয়োজনের উদ্দেশ্যে বারোটি দোকান সাজাতে বলেন। কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন যে, সুন্দরবনের মান রক্ষা করার জন্য হরিচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশ ছিল। শুধু তাই নয়, তিনি উল্লেখ করেন যে, সুন্দরবনের অভ্যন্তরে অনুষ্ঠিত এই রাস মেলায় শুধু মতুয়ারা নন, হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সকলে সমান হয়ে উঠবেন। কথিত আছে, ভক্তদের সাজানো বৃত্তাকারে বারোটি দোকানের মধ্যবর্তী স্থানে বসে সে সময় পাগল হরিভজন ধ্যানযোগে চোখ বন্ধ করে বসলেন। এরপর সেখানে অলৌকিকভাবে যুবা, বৃদ্ধ, শিশু, নর-নারী, সাধু, দরবেশের সমাবেশ ঘটে। শুধু তাই নয়, সেখানে হরিণ, শূকর, ব্যাঘ্র, বানর, সাপ, কুমির, পাখি প্রভৃতির সমাবেশ ঘটে। কিন্তু কারো মধ্যে কোনো দ্বেষ প্রকাশ পেল না। বরং একে অন্যের সঙ্গ পেয়ে স্বর্গ-সুখ অনুভব করল সকলে। পাশাপাশি হরিচাঁদ ঠাকুরের ১২টি আজ্ঞা প্রকাশ পেলো, যথা: ১. রাস মেলায় উপস্থিত সকলের মুখে সত্য ভাষা প্রকাশ পেল, ২. পরস্ত্রীতে মাতৃভাব রক্ষা হলো, ৩. ভিন্ন ধর্মের লোকজন একাসনে ভোজন করল, ৪. কারো ধর্মের কেউ নিন্দা করল না, ৫. কর্মে রত হয়ে মুখে হরি উচ্চারণের কথা প্রচারিত হলো, ৬. গুরুজনের প্রতি ভক্তির প্রকাশ ঘটল, ৭. প্রেমাগুনে ষড়রিপুর ভস্ম হলো, ৮. সাধু-ফকিরেরা বাহ্য পোশাক পরিত্যাগ করল, ৯. শান্তি-হরি স্মরণে ভাবাবেশে মজে থাকল সকলে, ১০. সর্বজীবে প্রেম রক্ষিত হলো, ১১. হৃদয়ে শ্রীহরি মন্দির স্থাপন করে সদা ইষ্ট চিন্তায় চিত্ত স্থির হলো এবং ১২. ঈশ্বরেতে এইভাবে আত্মদান করে সকলে মিলে শান্তি-হরিচাঁদকে স্মরণ করল। এরমধ্যে হঠাৎ সব দৃশ্য অন্তর্হিত হলো। তখন পাগল হরিভজনের ভক্তগণ ঊর্ধ্বে একটি আলো দেখতে পান। অন্যদিকে নীচে যেখানে হরিভজন পাগল বসেছিলেন সেখানে তাঁকে দেখা গেল না। পাগল হরিভজনকে সঙ্গে না দেখে তাঁর ভক্তগণ কাঁদতে শুরু করলেন। তখন ঊর্ধ্বে দেখা আলো হতে একটি বাণী ভেসে এলো: হে আমার ভক্তগণ, রাস পূর্ণিমার দিনে এখানে এলে আমার দর্শন পাওয়া যাবে। পরক্ষণেই আলো ক্ষীণ হয়ে গেলো। সহসা পাগল হরিভজনকে ভক্তগণ আবার তাঁদের সঙ্গে দেখতে পেলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি শূন্যে অবস্থান নিয়ে বলেন, এ তীর্থ একসময় সারা দুনিয়ার মানুষ মান্য করবে। জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে এখানে এসে সকলে শ্রী হরিচাঁদের নাম বলবে। এই কিংবদন্তিমূলক ইতিহাসকে মান্য করেই মতুয়া সম্প্রদায়ের পাশাপাশি বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের সাধারণ মানুষ দুবলার চরে রাস মেলা ও পুণ্যস্নানের ঐতিহ্য পালন করে থাকেন।

এই লৌকিক ইতিহাসের পাশাপাশি দুবলার চর রাস মেলার উদ্ভব নিয়ে আরও নানা কিংবদন্তি ও মিথ প্রচলিত রয়েছে। রাস মেলায় অংশগ্রহণকারীদের অনেকে বিশ্বাস করেন, দ্বাপর যুগে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সুন্দরবনের অভ্যন্তরে দুবলার চরের সমুদ্র-তটে এসে তাঁর অষ্টসখীসহ রাসলীলা করেছিলেন। সেই রাধা-কৃষ্ণ লীলার স্মরণে আদিকাল থেকে সুন্দরবনের অভ্যন্তরে রাস মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এছাড়াও, দুবলার চর রাস মেলায় উৎপত্তি নিয়ে আরও কয়েকটি কিংবদন্তি প্রচলিত রয়েছে।

একটি কিংবদন্তি অনুসারে জানা যায়, অনেক দিন আগে বঙ্গদেশের খুলনার পাইকগাছা উপজেলার রামনগরে ধনপতি নামে একজন সওদাগর ছিলেন। একদিন তিনি নৌপথে বঙ্গোপসাগরের তীর দিয়ে সমবিহারে সিংহল যাচ্ছিলেন। যেতে পথে হঠাৎ তিনি সমুদ্রের পানিতে একটি মোহনীয় পদ্মফুল দেখতে পান, যার ওপর অপরূপ এক দেবী দাঁড়িয়েছিলেন।

ধনপতি সওদাগর তাঁর এই দেবী দর্শনের ঘটনাটি সিংহলের রাজা শালিবাহার আর তার মন্ত্রী গজাননের কাছে খুলে বলেন। রাজা শালিবাহার সেই বর্ণনা শুনে সওদাগরকে বললেন, 'তিনি নিশ্চয় দেবী কমলকামিনী হবেন। আমরা তো তারই পূজা করি। কিন্তু তার কোনো দিন দর্শন পাইনি।' এই কথা বলে সিংহলের রাজা শালিবাহার দেবী দর্শনের জন্য সমুদ্রে নাও ভাসালেন। কিন্তু তিনি দেবী কমলকামিনীর দর্শন পেলেন না। এতে তিনি ক্ষুব্ধ

হয়ে ধনপতি সওদাগরকে সিংহলের কারাগারে বন্দি করে রাখলেন।

উল্লেখ্য, ধনপতি সওদাগর যখন সমুদ্রযাত্রায় বের হন তখন তাঁর স্ত্রী খুল্লনা ছিলেন গর্ভবতী। ধনপতি সওদাগর সিংহলের কারাগারে বন্দি হবার পর তার স্ত্রী খুল্লনা একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেন। তার নাম রাখা হয় শ্রীমন্ত। এই শ্রীমন্ত বড়ো হয়ে তার মায়ের কাছ থেকে জানতে পারেন যে, তার বাবাকে সিংহল রাজা শালিবাহার অন্যায়ভাবে বন্দি করে রেখেছেন। এ কথা শুনে শ্রীমন্ত তার বাবাকে উদ্ধার করার জন্য সিংহলের দিকে রওনা দেন। যাত্রা পথে তিনিও তার পিতার মতো সমুদ্র অভ্যন্তরে পদ্মফুলের ওপর দেবী কমলকামিনীকে অবলোকন করেন।

শ্রীমন্তও সিংহল পৌঁছে তার পিতার মতো রাজা শালিবাহারকে দেবী দর্শনের ঘটনাটি বলেন। সাথে সাথে রাজা শালিবাহার শ্রীমন্তকেও মিথ্যাবাদী অপবাদ দিয়ে তাঁর পিতা ধনপতি সওদাগরের মতো বন্দি করেন। এমনকি তাদের দুজনকেই মৃত্যুদণ্ড প্রদানের নির্দেশ করেন।

সহসা রাজার নির্দেশে জল্লাদরা পিতা-পুত্রকে মৃত্যুদণ্ড দেবার জন্য বলিকাঠে শুয়ে দেয়। কিন্তু যখন জল্লাদরা খড়্গ দিয়ে তাদের মাথা বিচ্ছিন্ন করতে উদ্যত হয় ঠিক তখনই অদৃশ্য থেকে দেবী কমলকামিনী দৃশ্যমান হন। তিনি বৃদ্ধার বেশে এসে রাজা শালিবাহারের কাছে পিতা ও পুত্রের জীবন ভিক্ষা চান। সিংহল রাজা সহসা দেবীকে চিনতে পারলেন এবং নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। ফলে পিতা-পুত্রকে মুক্ত করে দিলেন। শুধু তা-ই নয়, তিনি তার রূপসি কন্যাকে সওদাগরের ছেলের সাথে বিবাহ দিয়ে ধন-রত্ন ও মণি-মুক্তা বোঝাই করে বঙ্গদেশে পাঠিয়ে দিলেন।

কিন্তু পথিমধ্যে হঠাৎ সমুদ্রে গর্জন শুরু হলো। সওদাগরের তরী ডুবে গেল। এমন সময় দেবী কমলকামিনী পদ্মে ভেসে এসে তাদের উদ্ধার করে সুন্দরবনের অভ্যন্তরে কুঙ্গানদীর মোহনায় পৌঁছে দিয়ে ফের অদৃশ্য হয়ে যান। এই কুঙ্গানদীর তীরেই বর্তমানে দুবলার চর অবস্থিত। কিংবদন্তির সূত্রে জানা যায়, যেদিন দেবী কমলকামিনী তাদের উদ্ধার করেন সেদিন ছিল রাসপূর্ণিমা তিথি। এরপর থেকেই কুঙ্গানদীর মোহনায় বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন দুবলার চরে রাসপূর্ণিমার তিথিতে মা কমলকামিনীর পূজা উপলক্ষ্যে রাস মেলা ও পুণ্যস্নান অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

অপর একটি কিংবদন্তিতে জানা যায়, কোনো এক সাধু স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে দুবলার চরে সাধনা করতে এসেছিলেন। তিনি তার সাধনায় সিদ্ধি লাভ করার পরে সুন্দরবনের দুবলার চরে রাস মেলা ও পুণ্যস্নানের আয়োজন করেন। এ সকল কিংবদন্তি ও মিথের ভর করে সুন্দরবনের দুবলার চরে প্রতিবছর রাস মেলা পালিত হয়ে আসছে।

দুবলার চর রাস মেলার মূল আয়োজনের সাথে অতীতকাল থেকে সব ধর্মমতের মানুষের অংশগ্রহণের কথা জানা যায়। সুন্দরবনের অভ্যন্তরে এসে রাস মেলায় অংশ নেবার মাধ্যমে একদিকে মানুষ যেমন পুণ্য অর্জন করেন অন্যদিকে প্রাণী বৈচিত্র্যের সুন্দরবনের সৌন্দর্য অবলোকন করেন। এর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্য রচিত হয়। মূলত এই দর্শনকে ধারণ করে বাংলাদেশের সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী এলাকার তথা খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা প্রভৃতি জেলার মতুয়া সম্প্রদায়সহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষ সম্মিলিতভাবে রাস মেলায় অংশগ্রহণ করেন। সাধারণ জনগণের এই মিলনক্ষেত্র অবলোকন করে পরবর্তীকালে দুবলার চর রাস মেলার প্রবর্তক পাগল হরিভজনকে নিয়ে পুথিকাব্য রচিত ও প্রকাশিত হয়। চারণকবি স্বরূপেন্দু সরকার রচিত 'পাগল হরিভজন' পুথিকাব্যের প্রথম খণ্ড মতুয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে পঠিত হয়ে আসছে। এই পুথিকাব্যের বিংশালোক

তথা 'বাংলা ১৩৩০ সালে দুবলার চরে রাসের মেলা স্থাপন' শীর্ষক অধ্যায়ে দুবলার চরের রাস মেলার ইতিহাস বর্ণিত আছে। যতদূর জানা যায়, দুবলার চর রাস মেলায় এক সময় পুথিকাব্যের এই অংশ শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ করা হতো। শুধু তাই নয়, অতীতে সেই পুথিকাব্য পাঠের পাশাপাশি সর্ব প্রাণের মিলনের উদ্দেশ্যে নানা ধরনের সংগীত, নৃত্য ও বাদ্য বাদনের আনন্দে রাস মেলার আয়োজন মুখর হয়ে উঠত।

দুর্গম সমুদ্র ও নদী পরিবেষ্ঠিত সুন্দরবনের অভ্যন্তরে জেগে ওঠা দুবলার চরের যাবার জন্য বনবিভাগের অনুমতি সংগ্রহ করতে হতো গভীর রাতে এবং রাতের অন্ধকারে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দুবলার চরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করতে হতো। তাছাড়া, দুবলার চরে রাস মেলা প্রাঙ্গণে কোনো ধরনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বা পাবলিক টয়লেট না থাকায়, নারী, পুরুষ ও শিশু-কিশোরদের জন্য রাস মেলায় অংশগ্রহণে অনিহা দেখা দেয়। রাস মেলা প্রাঙ্গণে চলাচলের সুন্দর কোনো রাস্তা ছিল না। এমনকি রাস মেলা উপলক্ষ্যে রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের স্থাপনা সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থাপনা না থাকায় রাস মেলায় আগত পুণ্যার্থীদের মধ্যে কিছুটা হতাশা বিরাজ করত।

সার্বিক বিষয়ের উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধনের পাশাপাশি দুবলার চর রাস মেলার হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার, পুনর্জাগরণ এবং সাংস্কৃতিক তৎপরতা বৃদ্ধির জন্য ইউনেস্কোর পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের উদ্যোগে ভাবনগর ফাউন্ডেশন পর পর দুই বছর দুবলার চরে রাস মেলা আয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত হয়। এক্ষেত্রে রাস মেলার ঐতিহ্য ও ইতিহাস পুনর্গঠনের লক্ষ্যে বিশেষ করে রাস মেলা প্রবর্তনের সঙ্গে যুক্ত মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে প্রত্যক্ষ সংযোগ রচনায় উদ্যোগ নেওয়া হয়। ফলে প্রাণী বৈচিত্র্যের সুন্দরবনের অভ্যন্তরে অনুষ্ঠিত রাস মেলার ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত মাতম নৃত্য, পুথি পাঠ, হরিসংগীত প্রভৃতি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের যে যোগসূত্র নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল, তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। দুবলার চর রাস মেলার সার্বিক কর্মকাণ্ড সংরক্ষণে প্রশাসনিক ও সম্প্রদায়ের অতীতের শিথিল সম্পর্কসূত্র সম্প্রতি অনেকটা জোরদার হয়েছে।

সামগ্রিকভাবে দুবলার চর রাস মেলায় অংশগ্রহণকারীদের সুযোগ-সুবিধা অতীতের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন অতীতে রাস মেলা অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যাশিত চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে রাস মেলা প্রাঙ্গণে নারী ও পুরুষের ব্যবহারের জন্য দুটি পাবলিক টয়লেট স্থাপিত হয়েছে। যা রাস মেলায় আগত সম্প্রদায়ের মনে স্বস্তি ও শান্তি দিয়েছে। এছাড়া, রাস মেলা প্রাঙ্গণে চলাচলের সুবিধার জন্য পাকা রাস্তা গড়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, মেলা প্রাঙ্গণে স্থায়ীভাবে নির্মিত প্রশাসনিক ভবনে অবস্থান নিয়ে বাংলাদেশ সরকারে নিরাপত্তা শাখার সদস্যগণ রাস মেলায় আগত মানুষের নিরাপত্তা বিধান করেছেন। সার্বিক বিষয় রাস মেলায় অংশগ্রহণকারী বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা ও অন্যান্য অঞ্চলের সম্প্রদায়ের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে স্বস্তি এনে দিয়েছে। উল্লেখ্য, সর্বসাধারণের কাছে দুবলার চর রাস মেলা নামে পরিচিত হলে সাম্প্রতিককালে 'রাস উৎসব' ও 'রাস পূজা ও পুণ্যস্নান' নামে প্রশাসনিক সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

সর্বশেষ কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে সুন্দরবনের দুবলার চরে রাস মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে ৩-৫ই নভেম্বর ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দে। এই মেলার আয়োজনের জন্য ২৭ সদস্যের 'দুবলার চর রাস উৎসব জাতীয় কমিটি' গঠিত হয়। তাদের উদ্যোগে সুন্দরবনের দুবলার চর সাগর সঙ্গমে রাস উৎসব আয়োজনের সকল কর্ম সম্পাদিত হয়। জানা যায়, রাস উৎসব জাতীয় কমিটির উদ্যোগে ২৪শে

অক্টোবর ২০২৫ থেকে ২রা নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত রাস মেলা প্রাঙ্গণে উৎসবের উপযোগী করে তোলা হয়। তাদের উদ্যোগেই সাতক্ষীরা থেকে আগত ভাস্কর সুশান্ত কুমার সানা ও সুধাংশু কুমার রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে বনবিবি, গঙ্গা দেবী, শিব, মাধব পাটনি, রাধাকৃষ্ণ, ললিতা, বিশাখা, চম্পকলতা, চিত্রা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী, সুদেবীর ভাস্কর্য নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করেন। সকল ভাস্কর্য-এর জন্য তারা চরিত্র অনুযায়ী পোশাক ও অলংকার পরিয়ে সজ্জিত করেন। শুধু তাই নয়, তারা বিভিন্ন রঙের কাগজ কেটে মন্দির সাজিয়ে নান্দনিক আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছেন।

অন্যদিকে প্রায় একই সময়ে বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলার ভেকটমারির গুরুগৃহ মতুয়া মন্দির রাস মেলায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণের জন্য মতুয়া কৃত্য অনুসারে ঝান্ডা-নিশান তৈরি করেন। এছাড়া, তারা শিংগা, ডংকা, কাশি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সংগ্রহ করেন।

৩রা নভেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ৮টার দিকে বিভিন্ন অঞ্চলের মতুয়া ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের জনগণ সুন্দরবন পূর্ব ও পশ্চিম বন বিভাগে প্রয়োজনীয় রাজস্ব দিয়ে অনুমতি সংগ্রহের মাধ্যমে নদী পথে দুবলার চরের দিকে যাত্রা শুরু করে। প্রায় ৮ ঘণ্টার ধরে জলযানে যাত্রাপথে অধিকাংশ নৌকায় মতুয়া সম্প্রদায়ের লোকজন তাদের ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী 'হরি' নাম মুখে নিয়ে শিংগা, ডংকা ও কাশি বাজিয়ে মতুয়া সংগীত গেয়ে চলেন। সন্ধ্যার দিকে দুবলার চরে পৌঁছে তারা নৌকা থেকে নেমে প্রথমে 'হরি' নামের ধ্বনি তুলে ঝান্ডা-নিশান উর্ধ্বে তুলে ধরেন। এরপর সমুদ্রতলে সূর্য ডোবার আগ পর্যন্ত হরি-নামে পদযাত্রা করেন। এ সময় মতুয়া সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে হ্যান্ড মাইকের মাধ্যমে সমুদ্রতটে দাঁড়িয়ে থাকা নৌকার সকল যাত্রীকে পরের দিনের বিকালে অনুষ্ঠিতব্য রাস মেলার শোভাযাত্রা ও মাতম নৃত্যে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়।

৩রা নভেম্বর ২০২৫ তারিখ রাত ৮টায় গোপালগঞ্জ থেকে আগত মতুয়া সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যগত পুথি পাঠক নির্মলেন্দু দাস দুবলার চর রাস মেলা প্রাঙ্গণে চারণকবি স্বরপেন্দু সরকার রচিত 'পাগল হরিভজন' পুথিকাব্য থেকে 'দুবলার চর রাসের মেলা স্থাপন' অধ্যায় পাঠ করেন। ঐতিহ্যগতভাবে মোমবাতির আলোয় তাঁর পুথি-পাঠ সম্প্রদায়ের লোকদের মুগ্ধ করে। এই পুথির মধ্যেই বর্ণিত হয় রাস মেলার মূল দর্শন: 'হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ কিংবা মুসলমান। এখানে আসিলে হবে সকলে সমান'। এই দর্শনকে বাস্তব করে তুলতে দেখা যায় রাস মেলায় আগত সম্প্রদায়ের সদস্যসহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকদের। এক্ষেত্রে বাগেরহাটের রামপাল থেকে আগত মতুয়া সম্প্রদায়ের সাধকশিল্পী গোলক ঠাকুর মতুয়াদের ঐতিহ্যবাহী সংগীত তথা বেশ কয়েকটি 'হরিসংগীত' পরিবেশন করেন। অন্যদিকে বাউল-ফকির ও মুসলিমদের ভেতর থেকে বাউল অন্তর সরকার, ফতেহ কালাম ও জ্ঞানহীন নাইম প্রাচীন বাংলার বৌদ্ধগান চর্যাপদ পরিবেশন করেন। এতে করে দুবলার চর রাস মেলার সম্প্রীতির দর্শন প্রতিষ্ঠা পায়।

পরদিন ৪ঠা নভেম্বর ২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টায় আলোরকোল লঞ্চঘাট থেকে সম্প্রদায়ের সদস্যগণ ডংকা, কাসি, শিংগা বাজাতে বাজাতে পায়ে হেঁটে দুবলার চর রাস মেলা প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন। রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে পৌঁছে তারা মতুয়া সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি মাতম-নৃত্য করেন। এতে বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত নারী-পুরুষেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

বেলা ৩টা ৩০ মিনিটের দিকে ইউনেস্কোর পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের উদ্যোগে ভাবনগর ফাউন্ডেশন ও দুবলার রাস উৎসব জাতীয় কমিটির ব্যবস্থাপনায় রাস মেলা ২০২৫ আয়োজন সফল করার লক্ষ্যে মতুয়া সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে একটি আনন্দ-শোভাযাত্রা রাস মেলা প্রাঙ্গণ প্রদক্ষিণ করে। এতে সম্প্রদায় নির্বিশেষে রাস মেলায় আগত বিভিন্ন বয়সের নারী-পুরুষেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। এরপর রাস মেলা প্রাঙ্গণে উপস্থিতদের অনেকে আমাদের কাছে নিজেদের অভিমত প্রকাশ করেন।

সন্ধ্যা ৬টা থেকে ১২টা পর্যন্ত দুবলার চর রাস মেলা ২০২৫ উপলক্ষ্যে রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে পুরোহিত তরুণ আচার্য্য রাধাকৃষ্ণ পূজার শ্লোক পাঠ করেন। পূজার্চনা করেন। উপকরণ হিসেবে তিনি পানি ভর্তি ৫টি মাটির ঘট, শাখাসহ আমপাতা, সিঁদুর, মাটির প্রদীপ, আগরবাতি, ডাব, বিভিন্ন ধরনের ফুল ও পাতা সাজানো পাত্র, পূজার মন্ত্রের পুথি, ঘণ্টা প্রভৃতি ব্যবহার করেন। পানি ভর্তি প্রতিটি মাটির ঘটের গায়ে তিনি সিঁদুর দিয়ে একটি করে স্বস্তিকার চিহ্ন আঁকেন এবং মুখে শাখাসহ আম স্থাপন করেন। এছাড়া, পূজার সময় তিনি একটি বড়ো প্লেটে রাখা জবা ও অন্যান্য ফুল-পাতা এক হাতের আঙুলে নিয়ে রাধাকৃষ্ণ মূর্তির পায়ের দিকে ছুড়ে দিতে থাকেন। অন্য হাতে তিনি ঘণ্টা বাজাতে থাকেন। এ সময় সমাগত নারী ভক্তবৃন্দ উলুধ্বনি দিতে থাকেন। এরপর তিনি দুই হাতের করতল একসঙ্গে করে বুক বরাবর স্থাপন করে সংস্কৃত ভাষায় পূজার মন্ত্র আবৃত্তি করতে থাকেন। তার এই মন্ত্রপাঠের মধ্যে নারী ভক্তবৃন্দ সমস্বরে উলুধ্বনি দিতে থাকেন।

পুরোহিতের পূজার মন্ত্রপাঠ শেষ হতেই ভক্তরা মন্দিরের সম্মুখভাবে ভক্তি দিয়ে মোমবাতি ও আগরবাতি প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে মন্দিরের স্থাপিত রাধাকৃষ্ণের কাছে নিজের মনের অভিলাষ প্রকাশ করেন। শুধু তাই নয়, এ সময় বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ভক্তদের এক একটি দল ঢোল, করতাল, শিংগা, ডংকা, প্রভৃতি বাজিয়ে নৃত্য-গীত করে মন্দির প্রাঙ্গণ মুখর করে তোলেন। অনেক অঞ্চলের ভক্তরা নিজেদের উদ্যোগে প্রসাদ প্রস্তুত করে এনে মন্দিরে দান করেন। মন্দির থেকে সেই প্রসাদ আবার আগত সকল ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হয়।

রাত্রি যত গভীর হয় দুবলার চর রাস মেলার প্রাঙ্গণ ততই বর্ণিল হয়ে ওঠে। একসময় দেখা যায়, ফরিদপুর জেলার ভাঙা থেকে

একদল মানুষ কয়েকটি তুলসী গাছ মাথায় নিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণে এগিয়ে আসে। তারা এসে মন্দিরে ভক্তি দিয়ে তুলসী গাছগুলো মন্দিরের বাইরে বাম দিকের খোলা স্থানে স্থাপন করে। এরপর তারা 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' বলতে বলতে ১০০টি মোমবাতি জ্বালিয়ে সেই গাছগুলোর চারদিকে প্রদক্ষিণ করেন। শুধু তাই নয়, সেই দলের নারী সদস্যরা নৃত্যসহযোগে রাধাকৃষ্ণের গীত গাইতে থাকেন। রাত গভীর হলে মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে আগত পুণ্যার্থী ও মতুয়া সম্প্রদায়ের জনগণ যার যার নৌকায় গিয়ে ওঠেন। কেননা, শেষ রাত থেকে ভোর পর্যন্ত পুণ্যস্নানের সময়।

৫ই নভেম্বর ২০২৫ তারিখ ভোর রাতে নৌকাগুলো দুবলার চরের ফাঁকা ও নিরাপদ সমুদ্রতলে গিয়ে থামে। সকল পুণ্যার্থী ৩টা থেকে সকাল ৮টার মধ্যে নৌকা থেকে নেমে সমুদ্রতটে গিয়ে নামে এবং ধ্যানযোগে গঙ্গাদেবীর পূজা করেন। এক্ষেত্রে অধিকাংশ ভক্তগণ মোমবাতি, আগরবাতি জ্বালিয়ে গঙ্গাদেবীর বন্দনামূলক শ্লোক ও মন্ত্র পাঠ করেন। তারপর গঙ্গাদেবীর উদ্দেশ্যে সমুদ্রে ডাব, মিষ্টান্ন প্রভৃতি উৎসর্গ করেন। এভাবে তারা গঙ্গাদেবীর কাছে নিজের মনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কথিত আছে, এই পুণ্যস্নানের মাধ্যমে মানবজীবনের পাপ-খণ্ডন হয় এবং তারপর গঙ্গাদেবীর কাছে যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়। এবছর অনেককে পুণ্যস্নানের সময় সমুদ্রতটে মাটির তৈরি গঙ্গাদেবী ও রাধাকৃষ্ণের মূর্তি স্থাপনের মাধ্যমে পুরোহিতকে দিয়ে পূজা আচার পালন করতে দেখা গেছে।

লক্ষ্যণীয় বিষয় পুণ্যস্নান কালে সমুদ্রতটে অনেক গানের দল কীর্তন পরিবেশন যেমন করছিল তেমনি ডংকা বাদন দল ডংকা ধ্বনিতে সাংস্কৃতিক উৎসবের চরিত্র দান করেছিল সেখানে। এরই মধ্যে সকাল ৭টা থেকে ৮টার দিকে দুবলার চর পুণ্যস্নান প্রাঙ্গণে এসে নামে একটি জাহাজে আসা বেশ কয়েকজন জাপানিজ পর্যটক। তারা ভাবনগর ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে অংশ নেন।

৫ই নভেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ৮টার পর সমুদ্রে প্রবল জোয়ার আসতে শুরু করে। সমুদ্রতট মুহূর্তের মধ্যে ছোটো হতে হতে এক সময় মিলিয়ে যেতে থাকে। তাই সকলের দ্রুত নৌকায় ওঠার সময় হয়। সকল পুণ্যার্থী ও পর্যটক যে যার মতো দ্রুত যার যার জলযানে আশ্রয় নেয়। জলযান চলতে শুরু করে দুবলার চরের রাস মেলার রাত ও পুণ্যস্নানের সকালটাকে পেছনে ফেলে। এবছরের অপূর্ণতা সামনের বছরের পূর্ণ হয়ে আবার সকলে রাস মেলা ও পুণ্যস্নানে ফিরে আসবেন সকলের মনে ও প্রাণে এই প্রেম গেঁথে থাকে।

ড. সাইমন জাকারিয়া: লোকসংস্কৃতি গবেষক, নাট্যকার এবং বাংলা একাডেমির গবেষণা উপবিভাগের উপপরিচালক
dr.zakariasaymon@gmail.com

নবান্ন উৎসব এবং বাঙালির সম্প্রীতি

ড. সবুজ শামীম আহসান

কোনো জাতির আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, ধর্ম, ভাষা, উৎসব,মূল্যবোধ, খাদ্য, পোশাক, কাজের ধারা ইত্যাদি মিলে তৈরি হয় তার সংস্কৃতি। সংস্কৃতিই মানুষের পরিচয় বহন করে। বৈচিত্র্যময় উৎসব পালন বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

বাংলাদেশের প্রায় ৯৮ ভাগ মানুষ জাতিগতভাবে বাঙালি।[১] বাঙালিরা বছরে নানা ধরনের উৎসব পালন করে। উৎসব এবং বাঙালি একই সূত্রে গাঁথা। নির্মল আনন্দের জন্য বাঙালিরা বিভিন্ন উৎসব আয়োজন করে থাকে। নবান্ন উৎসব বাঙালির হাজার বছরের কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও জীবনযাত্রার প্রতিচ্ছবি। একদিকে নতুন ধান ঘরে তোলার আনন্দ অন্যদিকে প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য এ নবান্ন উৎসব পালন করা হয়। মূলত শস্যভিত্তিক একটি লোক উৎসবের নাম নবান্ন।[২] আসল কথা হলো নবান্ন উৎসব বাঙালির লোকজ আনন্দ উৎসব। বাংলাদেশের প্রায় ৮০ ভাগ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। তাই নতুন ধান বা ফসল ঘরে তোলা একটি আনন্দের বিষয়।

ঘরে ঘরে জ্বলে চুলা, হাসে মায়ের মুখ,
নবান্ন উৎসবে মেলে সুখের অনন্ত সুখ।
কৃষকের ঘাম আজ ফলেছে সোনার ধান,
এই নবান্নে জেগে ওঠে মাটির প্রাণের টান।

প্রধানত বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সনাতন ধর্মের মানুষ নবান্ন উৎসব পালন করেন। তবে বাঙালি মুসলমানসহ বাংলাদেশের বসবাসরত প্রায় ৪৫টি আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই এ নবান্ন উৎসব পালন করে থাকেন।[৩]

নবান্ন মানে নতুন অন্ন। হেমন্তকালীন ধান কাটার পর নতুন চালের পিঠা-পায়েস প্রভৃতি খাওয়ার উৎসব ও পার্বণ বিশেষের নামই নবান্ন উৎসব।[৪] নবান্ন উৎসবে বাঙালির আনন্দের সাথে ব্যস্ততাও বেড়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়:

জননী, তোমার শুভ আহ্বান গিয়েছে নিখিল ভুবনে–
নূতন ধান্যে হবে নবান্ন তোমার ভবনে ভবনে।
অবসর আর নাহিকো তোমারড় আঁটি আঁটি ধান চলে ভারে ভার,
গ্রামপথে-পথে গন্ধ তাহার ভরিয়া উঠিছে পবনে।
জননী, তোমার আহ্বান লিপি পাঠায়ে দিয়েছ ভুবনে।

সাধারণত হেমন্তে আমন ধান কাটার পর অগ্রহায়ণ বা মাঘ মাসে গৃহস্থরা এ উৎসবে মেতে উঠত। নবান্ন উৎসব উপলক্ষ্যে বাড়ির আঙিনায় আলপনা আঁকা হয়, পিঠা-পায়েসের আদান-প্রদান করা হয় এবং আত্মীয়স্বজনদের আগমনে গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে আনন্দঘন পরিবেশ তৈরি হয়। পাড়ায়-পাড়ায় চলত কীর্তন, পালাগান ও জারিগানের আসর। কৃষকেরা নতুন ধান বিক্রি করে

নতুন পোশাক পরিচ্ছদ কিনত। এখন আর আগের মতো জাঁকজমকপূর্ণভাবে নবান্ন উৎসব পালিত হয় না।[৫] অধিক শস্যপ্রাপ্তি, বৃষ্টি, সন্তান, পশুসম্পদ কামনা এ উৎসব প্রচলনের প্রধান কারণ।[৬]

ধানের গন্ধে ভরে গেছে মাঠ,
আকাশ হাসে, কৃষাণের হাত।
নতুন ধানের সোনালি দান,
ঘরে ঘরে আজ নবান্ন গান।

বাঙালি সংস্কৃতি নানা জাতি উপজাতির মেলবন্ধনে গড়ে উঠেছে।[৭] তাই যে-কোনো ঋতুতে এ উৎসব পালিত হয়ে থাকে। উত্তর-পশ্চিম ভারতের ওয়াজিরাবাদে নবান্ন উৎসব পালিত হয় বৈশাখ মাসে। উল্লিখিত অঞ্চলে রবিশস্য, গম ঘরে তোলার আনন্দে এ বৈশাখি নবান্ন উৎসব পালন করা হয়। দক্ষিণ ভারতেও এ ধরনের নবান্ন উৎসব প্রচলিত আছে। বাংলাদেশের প্রধান কয়েকটি উপজাতি তাদের প্রধান ফসল ঘরে তোলার পর নবান্ন উৎসব পালন করে থাকেন। শাওতালরা পৌষ-মাঘ মাসে শীতকালীন প্রধান ফসল ঘরে তুলে সাতদিন ধরে গানবাজনা ও মদ্যপানের মাধ্যমে সোহরায় অনুষ্ঠান পালন করেন।[৮]

কবি জীবনানন্দ দাশ তার কবিতায় লিখেছেন–

আবার আসিব ফিরে ধান সিঁড়িটির তীরে এই বাংলায়।
মানুষ নয়- হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে।
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে।
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল ছায়ায়।

কবির কবিতার লাইনের মতোই নবান্নে চিরায়ত বাংলার রূপ। কার্তিক ও অগ্রহায়ণ নিয়ে হেমন্ত ঋতু। একসময় গ্রামাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ নামত। যার নাম ছিল মঙ্গা কার্তিক। তাই কবে কার্তিক পেরিয়ে অগ্রহায়ণ আসবে সে প্রতীক্ষায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন কাটত। আজকাল বাঙালির এ প্রাণের উৎসবের আয়োজনে ভাটা পড়েছে।

সনাতন ধর্মের সংস্কারমতে অন্নের আরেক নাম প্রাণ। প্রাণের যজ্ঞই প্রকৃতপক্ষে বিগত আত্মার প্রতি নিবেদন।

মুসলিমরা নতুন ধান কেটে বউ, মেয়ে-জামাইসহ স্বজনদের দাওয়াত করে আনত। তাদের নিয়ে চলত পিঠা উৎসব। নতুন ধান ঢেঁকি দিয়ে গুঁড়ো করে তৈরি করা হতো হরেকরকম পিঠা। যেমন- ভাপা, চিতই, দুধপুলি, পিঠা পুলি, পায়েস, সেমাই পিঠা, ক্ষীর, খই, মুড়ি প্রভৃতি।

নগরেও বাড়ির প্রাঙ্গণে, স্কুলের মাঠে হতো নাটক, গান, যাত্রাপালা, জারি-সারি, নবান্নের গান, নাচ, বাউল গান, পালাগানের আসর। কোথাও কোথাও গ্রাম্য মেলা সেখানে নাগরদোলা, পুতুলনাচ প্রভৃতির আয়োজন করা হতো।

বাংলাদেশের বগুড়া অঞ্চলে এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান ও বীরভূম জেলায় নবান্ন উৎসব আবহমানকাল থেকে চলে আসছে।

বাঙালি সংস্কৃতির দিকে নজর দিলে দেখা যায় তাতে যতটা বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়, ততোটা ঐক্য দেখা যায় না।[৯]

বাংলাদেশের যশোর জেলার বিভিন্ন সংগঠন বিশেষ করে উদীচী, তির্যকসহ অনেক সংগঠন এবং নড়াইল জেলার ধোপাখোলা এলাকায় নন্দনকানন প্রতিবছর ধুমধামের সাথে নবান্ন উৎসব

পালন করে থাকে। নন্দনকাননের এ নবান্ন উৎসবে প্রায় ১০০ ধরনের পিঠা, শত শত নকশিকাঁথা এবং মাটি ও কাঠের তৈরি বিভিন্ন উপকরণ। একই নড়াইলের আঞ্চলিক গান। হাজার দর্শক তা প্রাণ ভরে উপভোগ করত।

নতুন ধানের গন্ধে ভরে,
মাটির ঘ্রাণে মন যে মরে।
পিঠে-পায়েস, দুধে ভাত,
নবান্নে মেলে সুখের রাত।

কৃষকদের প্রধান ফসল আমন ধান ঘরে তোলার উৎসব হলো নবান্ন। অতীতে নবান্ন ছিল গ্রামবাংলার কৃষক সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান পার্বণ।[১০] ১৯৯৮ সালে ঢাকা শহরে আনুষ্ঠানিকভাবে নবান্ন উৎসব শুরু হয়।

জাতীয় নবান্নোৎসব উদ্‌যাপন পর্ষদ প্রতিবছর পহেলা অগ্রহায়ণ তারিখে নবান্ন উৎসব উদ্‌যাপন করে। 'উৎসব বাংলা' ৩ দিনব্যাপী নবান্ন উৎসব আয়োজন করে আসছে রমনা বটমূলে। এছাড়া সাংস্কৃতিক সংগঠন শোবিজ এন্টারটেইনমেন্ট রাজধানীর ধানমন্ডি রবীন্দ্র সরোবর বিগত ১২ বছর যাবৎ ৩ দিনব্যাপী নবান্ন উৎসব ও পিঠা মেলা আয়োজন করে আসছে। এ উৎসবে ৩৩টি স্টলে ২০০ ধরনের পিঠা থাকে। এছাড়া উৎসব প্রাঙ্গণের উন্মুক্ত মঞ্চে প্রতিদিন সকাল ৭টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত আয়োজন করা হয় নবান্নের নাচ, নবান্নের গান, লোকগীতি লালনগীতি বাউলগান, সাপ খেলা, বানর খেলা, লাঠিখেলা, নাগরদোলা, পুতুলনাচ, পালকি, পথ নাটকসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। এ নবান্ন উৎসবের সমাপনী দিনে সেরা পিঠা শিল্পীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। তাই বলা যায় যে বাংলার একটি অন্যতম জনপ্রিয় উৎসব নবান্ন উৎসব।

এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ বেশ ঘটা করেই পালন করে নবান্ন উৎসব। বর্ণিল আয়োজনের মধ্য দিয়ে ৩ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে রাজধানীবাসী উপভোগ করে থাকে। নানারকমের পিঠাপুলির আয়োজন থাকে নবান্ন উৎসবে। আমাদের দেশে নবান্ন উৎসবে অঞ্চলভেদে চলে জারি, সারি, মুর্শিদি, লালন, পালা, ও বিচার গান। আর মেলায় পাওয়া যায় নানা স্বাদের খাবার। ছোটোদের বাড়তি আনন্দ দিতে মেলায় আসে নাগরদোলা, পুতুলনাচ, সার্কাস ইত্যাদি।

বর্তমানে বাংলাদেশের মানুষ বিভিন্ন কারণে বিশেষ করে বস্তুবাদী মনোভাব, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বেশি সময় দেওয়া,

সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ, রক্ষণশীলতার কারণে নবান্ন উৎসব পালনে আগের মতো মনোযোগী হচ্ছে না। তবে আশার কথা হলো একবিংশ শতাব্দীর নতুন প্রজন্মের মধ্যে নবান্ন উৎসবসহ অন্যান্য উৎসব পালনে আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

নবান্ন উৎসবের তাৎপর্য

মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে, বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্য ধরে রাখতে তথা মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় নবান্ন উৎসবের গুরুত্ব অপরিসীম।

নির্মল চিত্তবিনোদন

নির্মল আনন্দের জন্য নবান্ন উৎসবের গুরুত্ব অপরিসীম। আধুনিক যুগে মানুষ যখন সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের জন্য নিজস্ব সংস্কৃতি ভুলতে বসেছে তখন নবান্ন উৎসব পালন মানুষকে তার নিজস্ব সংস্কৃতি পালনের প্রতি আকৃষ্ট করছে।

ঐতিহ্য রক্ষা

এটি বাংলার হাজার বছরের কৃষি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধারণ করে এবং তরুণ প্রজন্মের কাছে শেকড়ের আনন্দ তুলে ধরে।

নতুন ফসলের আনন্দ

হেমন্তকালে আমন ধান পাকার পর, নতুন ধান থেকে চাল তৈরি করে প্রথম রান্নার উৎসব। যার জন্য কৃষকের মনে আনন্দ বিরাজ করে।

সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় করে

ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই একসঙ্গে এই উৎসব পালন করে, যা গ্রামীণ সামাজিক সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে।

সৌভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করা

নতুন চালের গুঁড়া দিয়ে ভাপা, চিতই, দুধপুলি, পায়েস ও ক্ষীরসহ নানা স্বাদের পিঠা তৈরি করে আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের আপ্যায়ন করা হয় যাতে সকলের সাথে একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

মাদকমুক্ত সমাজ

আমাদের দেশীয় উৎসব নতুন প্রজন্মকে এমনভাবে আকৃষ্ট করে যা তাদেরকে নেশা থেকে দূরে রাখে।

কৃষক ও প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা

নতুন ফসল ঘরে আসার আনন্দে সৃষ্টিকর্তা বা প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর একটি উপায় হিসেবে এই উৎসব পালন করা হয়।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক স্বস্তি

বিভিন্ন উৎসব আয়োজনের ফলে অনেকেরই কাজের ব্যবস্থা হয়। নতুন ধান ঘরে আসায় কৃষকের ঘরে অন্ন সংস্থান নিশ্চিত হয়, যা গ্রামীণ অর্থনীতিতে স্বস্তির বার্তা নিয়ে আসে।

এছাড়াও মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠা; সামাজিক বিচ্ছিন্নতা রোধ; ভালো অভ্যাস গড়া; সামাজিক দ্বন্দ্ব দূর; নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশ; অসাম্প্রদায়িক সমাজ প্রতিষ্ঠায় নবান্ন উৎসবের গুরুত্ব অপরিহার্য।

নবান্ন উৎসব বাঙালির আদি পার্বণ। প্রকৃতির সাথে মিলেমিশে থাকার একটি উৎসব। নবান্ন উৎসব শুধু নতুন ধান ঘরে তোলার উৎসব নয়; এটি বাংলার কৃষি, সংস্কৃতি, ঐক্য ও আনন্দের প্রতীক। কিন্তু অনেকেই পিঠা উৎসবকে নবান্নের সঙ্গে এক করে ফেলেন। বাস্তবতা হলো বনান্নের একটি উপাদান হলো পিঠা উৎসব। এ উৎসব আমাদের কৃষিজীবী জীবনের আনন্দ ও বৈচিত্র্যকে তুলে ধরতে এবং হাজার বছরের পুরনো এই ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে। এটি গ্রামীণ অর্থনীতিতে সচ্ছলতা আনার বার্তা দেয়, নতুন চালের পিঠা-পায়েসের মাধ্যমে আত্মীয়স্বজনের সাথে মিলন ঘটায় এবং কৃষকের ঘরে ফসল তোলার আনন্দ উদ্‌যাপনের মাধ্যমে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন দৃঢ় করে।

তথ্যসূত্র

১. *ছোটদের বাংলাপিডিয়া: বাংলাদেশ ও বিশ্ব, সম্পাদনা, আহমেদ আবদুল্লাহ জামাল, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা: ৬;*

২. *পূর্বোক্ত, আহমেদ আবদুল্লাহ জামাল, পৃষ্ঠা: ৬৯;*

৩. *পূর্বোক্ত, আহমেদ আবদুল্লাহ জামাল, পৃষ্ঠা: ৬;*

৪. *আধুনিক বাংলা অভিধান, সম্পাদনা, জামিল চৌধুরী, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন ২০১৬, পৃষ্ঠা: ৭১৫;*

৫. *পূর্বোক্ত, আহমেদ আবদুল্লাহ জামাল, পৃষ্ঠা: ৬৯;*

৬. *বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, খণ্ড-৬, সম্পাদনা, সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, মার্চ ২০০৩, পৃষ্ঠা: ৩৩৬;*

৭. *সমন্বয় সাধনা প্রেক্ষিত লোকসংস্কৃতি, সম্পাদনা, আব্দুর রহিম গাজী, বঙ্গিয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, জুলাই ২০১৯, পৃষ্ঠা: ১৩;*

৮. *পূর্বোক্ত, সিরাজুল ইসলাম, পৃষ্ঠা: ৩৩৬;*

৯. *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, গোলাম মুরশিদ, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃষ্ঠা: ২৬৭;*

১০. *সতীর্থ রহমান, হারিয়ে যাচ্ছে নবান্ন উৎসব, প্রতিদিনের সংবাদ, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬;*

ড. সবুজ শামীম আহসান: সহযোগী অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, যশোর সরকারি সিটি কলেজ যশোর,
govtcitycollegejessore@gmail.com

হুমায়ূন আহমেদের *নন্দিত নরকে*: বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারের ধূসর পাণ্ডুলিপি

গাজী আজিজুর রহমান

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর (১৯৩৮) দশ বছর পর হুমায়ূন আহমেদের জন্ম (১৯৪৮)। শরতের শেষ উপন্যাস *বিপ্রদাস* (১৯৩৫) প্রকাশের সাইত্রিশ বছর অন্তে ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয় হুমায়ূনের প্রথম উপন্যাস (কিছুটা নভেলটধর্মী) 'নন্দিত নরকে'। শরৎচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস *বড়দিদির* (১৯০৭) সঙ্গে হুমায়ূনের প্রথম সৃষ্টির ব্যবধানকাল পয়ষট্টি বছরের। এরমধ্যে দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধ ঘটে গেছে। ভারতবর্ষ ভাগ হয়েছে। পাকিস্তানের পাঁজর থেকে জন্ম হয়েছে বাংলাদেশের। বদলে গেছে জীবনদর্শন, বিশ্বাস, রুচি, রাজনীতি, অর্থনীতি। জন্ম নিয়েছে আধুনিকতার ফিনিক্স পাখি থেকে অতি-আধুনিকতা, উত্তর আধুনিকতা। পরিবর্তিত হয়েছে মানব সমাজ, সভ্যতা ও পরিবারের ধারণা। মানব সম্পর্কের জটিল অনুষঙ্গগুলো ভাঙচুর হতে হতে এগিয়ে চলেছে পৃথিবী।

এমন একটা বৈরী প্রেক্ষাপটে আমাদের কবিতা, নাটক ও কথা সাহিত্যে আবির্ভূত হন একঝাঁক নতুন সাহিত্যকর্মী। তারুণ্যে যারা উজ্জ্বল ও দ্রোহী কিন্তু চেতনায় গভীরভাবে পীড়িত, আহত, বিষণ্ন মুদ্রায় মুদ্রিত। মহাদেব সাহা, আবুল হাসান, আবু কায়সার, আবিদ আজাদ, সেলিম আল দীন, আল মনসুর, কায়েস আহমেদ, সেলিনা হোসেন, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, হুমায়ূন আহমেদ এই কালপর্বের রক্ত, ক্ষত, পুঁজ ও বহ্নি নিয়ে উঠে আসেন রক্তের দাগ শুকানো দেশের প্রচ্ছদে। সেই রক্তের দাগের উপর আবার রক্ত ঝরে। ঘরে ফেরা হয় গৃহ পরবাসী। ফুল থেকে বেরিয়ে আসে কীট। পা বাড়ালেই সাপের ছোবল। আসে আকাল। আসে অন্ধকার। আসে 'সবুজ দাবাগ্নিদগ্ধ পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইলের নষ্টভ্রষ্ট' ক্ষতবিক্ষত স্বদেশের ছবি। চেনা দেশটা ক্রমে অচেনা হতে থাকে, চেনা মানুষগুলোকেও মনে হতে থাকে অচেনা, কে আপন কে পর শনাক্ত করা হয়ে পড়ে দুরূহ। ভবিষ্যৎ-স্বপ্নসম্ভাবনা হয়ে পড়ে গৃহবন্দী—মানুষের এই গৃহগত সন্ন্যাস জীবনকে আঁকড়ে ধরে যে গৃহকাব্যের স্বরূপ উন্মোচিত হয়, লেখা হয় নতুন কালের উপাখ্যান—হুমায়ূন আহমেদ তাদেরই একজন। দান্তে ও র‍্যাঁবোর মতো *নন্দিত নরক* থেকে যার অগস্ত্য যাত্রা।

হুমায়ূন আহমেদ তখন বয়সে একেবারেই তরুণ—মাত্র চব্বিশ বছর। তখনো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের ছাত্র। যে বয়সটা কেবল শিক্ষানুশীলনের, ভবিষ্যতের, স্বপ্নের, চাকরি আর ক্যারিয়ার নির্মাণের, স্টাবলিশমেন্টের-তখনই প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে, সবাইকে হতবাক করে প্রকাশিত হয় হুমায়ূনের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ উপন্যাস *নন্দিত নরকে* (১৯৭২)। একটা ছোট্ট ঢিল যেন ছুঁড়ে দেওয়া হলো আধুনিক বাংলা উপন্যাসের সরসী সরোবরে।

নামহীন, পরিচয়হীন এই ঔপন্যাসিকের দেওয়া নামের মহিমায় আকৃষ্ট হয়ে গল্পটি পড়তে শুরু করেন এ দেশের বিশিষ্ট লেখক ও সমালোচক ড. আহমদ শরীফ। গ্রন্থটির ভূমিকায় তিনি বলেছেন, 'পড়ে আমি অভিভূত হলাম। গল্পে সবিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেছি একজন সূক্ষ্মদর্শী শিল্পীর; একজন কুশলী শিল্পীর পাকা হাত। বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে এক সুনিপুণ শিল্পীর, এক দক্ষ রূপকারের, এক প্রজ্ঞাবান স্রষ্টার জন্মলগ্ন যেন অনুভব করলাম।' তাঁর এই বক্তব্যে এতটুকু অতিশয়োক্তি নেই। তিনি পাকা জহুরীর মতো চিনতে পেরেছিলেন এই তরুণ লেখককে। অচিরেই প্রমাণ হলো বাংলা সাহিত্যে এমন এক জীবন শিল্পীর আবির্ভাব ঘটেছে গত একশো বছরে শরৎচন্দ্রের পর তার স্থান অদ্বিতীয়।

মধ্যবিত্ত সব পরিবারেই একটা লজ্জার গল্প আছে। এই সব পরিবারে কোনো স্বর্গের দেবতারা বাস করে না, আবার কীটেরাও বাস করে না। বাস করে কিছু পাপ-পুণ্যের মানুষ। পুণ্যটা আমরা প্রদর্শন করি, পাপটা ঢেকে ভালো মানুষ সাজার অভিনয় করি। কিন্তু সত্য গোপন থাকার নয়, আগুন ছাই চাপা থাকার নয়। ইউদিপাস, হ্যামলেট, ওথেলোর কাহিনি তার জ্বলন্ত উদাহরণ। হুমায়ূন আমাদের মধ্যবিত্ত ঘরের সেই কাহিনি, মনের কথা, হৃদয়ের কথা টেনে বার করে ছড়িয়ে দেন মধ্যবিত্তের ঘরে ঘরে। যেমন দিয়েছেন শরৎচন্দ্র, কাজী ইমদাদুল হক, আবুল বাশার। হুমায়ূন আহমেদ তাদেরই যোগ্য উত্তরসূরি।

একটি অস্বচ্ছল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারকে কেন্দ্র করে *নন্দিত নরকে* উপন্যাসের ব্যবচ্ছেদ ও বিস্তার। এই পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা আটসহ আরো বিশ-বাইশটি সংযোগ চরিত্র বা অপ্রধান চরিত্র আছে। এই উপন্যাসের মূল চরিত্র বাড়ির বড়ো ছেলে (বড়ো মেয়ে রাবেয়ার ছোটো) খোকার (কথক বা হুমায়ূন আহমেদ নিজে) ভাবনার আয়নায় এর কাহিনির দৃশ্যায়ন ও চরিত্রসমূহের চিত্রায়ন। এটি একটি চরিত্র প্রধান উপন্যাস বা মিলিত চরিত্রের উপন্যাস অথবা ফুল, পাতা, কুঁড়ি, বৃত্ত, শাখা-প্রশাখা মিলে মূল কাণ্ডহীন উপন্যাস। একটু ঝড় বা আঘাতে তাই এর সব কিছু ভেঙে পড়ে, ঝরে যায়, ফুরিয়ে যায়। আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো যে এখন শিকড়হীন, ভাসমান, উপন্যাসটি সে ইঙ্গিতও বহন করে।

ঘটনা ও কাহিনি ছাড়া যেমন জীবন হয় না, তেমনি উপন্যাসও হয় না। এইসব ঘটনা ও কাহিনিকে একটি ঐক্যের মধ্যে এনে ঔপন্যাসিক একটা পরম্পরা তৈরি করেন স্থান-কাল ও কিছু পাত্রপাত্রীর সমন্বয়ে। *নন্দিত নরকে* তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। এখানে স্থান একটা আধা শহর, কাল স্বাধীনতার পর, আর পাত্র-পাত্রী মধ্যবিত্ত এক স্কুল মাস্টারের পরিবার (পরে তিনি একটি ফার্মের ক্যাশিয়ার)। পরিবারের অন্য সদস্য স্ত্রী শাহানা ওরফে শানু একজন আদর্শ গৃহিণী। বড়ো মেয়ে রাবেয়া কিছুটা লেখাপড়া শিখে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় পার করছে বাইশটি বসন্ত। বড়ো ছেলে খোকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন শাস্ত্রের শেষ বর্ষের পরীক্ষার্থী; ছোটো মেয়ে রুনু স্কুল ছাত্রী, সবে চৌদ্দতে পা দেবে। ছোটো ছেলে মন্টু (বড়ো মার ছেলে, সেই মা বর্তমানে মৃত) বিএ পড়ছে। অত্যন্ত রাগী ও গোয়ার। অপর সদস্য মাস্টার কাকা রাবেয়ার বাবার ক্লাশ ফ্রেন্ড, আজও অবিবাহিত, এই বাড়িতে দীর্ঘকাল আশ্রিত এবং এই বাড়ির প্রিয় কুকুর পলাকে (পলাতক বলে পলা নামে পরিচিত) নিয়ে মূলত এই উপন্যাসের কাহিনি। বাকিদের উপস্থিতি উপসংঘ ও অনুষঙ্গ হিসেবে। এদের মধ্যে উল্লেখ্য শান্তি কটেজের হারুণ ভাই, নাহার ভাবী, ননদ শীলা বা শিলু, খোকার অংকের স্যার টগর ভাই ও তার বোন নিলু এবং মন্টুর সহপাঠী ইয়াসমিন। চরিত্র বলতে যা বোঝায় এরা কেউ ঠিক তেমন নয়— এরা কিছু মানুষ মাত্র। তাও পূর্ণ নয়—আধা, সিকি, দশমিকে বিভক্ত। এদের অপূর্ণতাকে কিছুটা সমৃদ্ধ করেছে জ্যোৎস্না, নীল রং, হাসনাহেনা, কাঠালি চাঁপার গন্ধ, অন্ধকার, জোনাকি, চন্দ্রবোড়া সাপ, পলা ও রবীন্দ্রসংগীত। অনেকটা ব্লেক ও জীবনানন্দের এপিফ্যানিক আবহে উন্মীলিত হয় হুমায়ূনের কাহিনির প্যাটার্ন।

এই উপন্যাসে ৭১ পরবর্তী অস্থির, স্থিতিহীন, সহিংস, দুর্বিনীত বাংলাদেশের কোনো পরিচয় নেই। এ যেন ষাটের দশকের স্থবির, অচঞ্চল, আত্মপীড়িত এক লাজুক বাংলাদেশ—যার প্রতীক খোকা। বিকলাঙ্গ বাংলাদেশের প্রতীক রাবেয়া, আর কিছুটা ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ বাংলাদেশের প্রতীক মন্টু, আর পরাধীন বাংলাদেশের প্রতীক মাস্টার কাকা এবং প্রাণচঞ্চল নবীন বাংলাদেশকে ধারণ করে আছে রুনু। রাবেয়ার বাবা-মায়ের ভূমিকাটি চিরকালের বাংলার যে পরিবার প্রথা-মায়ামমতা-ভালোবাসা-স্নেহের বন্ধন তারই পুরানো প্রতীক। এই ঐতিহ্য হুমায়ূনের হাতে আধুনিক হয়ে যখন বর্ণনা, বিশ্লেষণ, বোধ ও বক্তব্যের বাচন হয়ে ওঠে আধুনিক। বোঝার উপায় নেই তার লেখার ভেতর জয়েস, কামু, কাফকা, হার্ডি, রবীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব বসু, হারুকি মুরাকামির ছায়া ঘুরে বেড়ায়। এরা যেমন গল্প খোঁজেন নিজের ভেতর, সমাজ ও ইতিহাসের মধ্যে নয়, তেমনি হুমায়ূন এক আত্মতাড়িত লেখক। আত্মার কাছে তাই তার সব স্বপ্ন, অভিজ্ঞতা, এষণা সমর্পিত।

ষাটের রুচিশীল, আদর্শিক নির্লিপ্তিকে ধারণ করে তরুণ হুমায়ূন দেখেছেন এক নষ্ট সময়, ভাঙনের সময়, শুভ ও শ্রেয়ের পতনের সময়। আলোড়িত হয়েছেন সেই জনগোষ্ঠীর প্রণোদনায় যারা এই কালপর্বে খুব অসহায়, হতাশ, নিরাবলম্ব, নির্জন ও নিমজ্জন। যারা খড়কুটোর মতো আঁকড়ে আছে এখনো কিছু মূল্যবোধ, আদর্শ, প্রোটোনিক প্রেম, পারিবারিক সংস্কার, নান্দনিক বোধ—তাদের দুঃখ-কষ্ট-অনুতাপ নিয়েই হুমায়ূন আহমেদের *নন্দিত নরকে* যাত্রা। এখানে সব কিছুই খুব নেগেটিভ। যেমন নেশা, নির্ঘুম, অবসাদ, মৃত্যু, বৈকল্য, তিমিরময়ী দুঃখ, শঙ্কা ও ভয়। আবার কীভাবে আছে লিরিক্যাল প্রেম, রবীন্দ্রসংগীত, জ্যোতির্বিদ্যা, কোরানের মিষ্টিসুর, পাথরের গুণে বিশ্বাস, ভদ্র জীবনযাপনের স্বপ্ন, 'জোনাকি ঝিকিমিকির জ্বালো আলো'র গান ইত্যাদির জীবন কোলাজ। জীবনের যত নিবিড় অনুষঙ্গ, আত্মীয়তা, আঁধিয়ার তাকেই তিনি রঙে-রূপে-রসে-বেদনার শিল্পে শিল্পিত করে পরিবেশন করেছেন *নন্দিত নরকের* পবিত্র-পাপ-প্রতীপ সুবর্ণ দেউলে।'

কেউ যেন বুঝতে নারাজ বাঙালি মধ্যবিত্ত মুসলমান পরিবারে তৎকালে *নন্দিত নরকে* একটি সাহসী কাহিনি। প্রেমে নয় পাপেও যে পরিবারগুলো নিমজ্জিত এ সত্য জেনেও আমরা না জানার ভান করি। অথচ এ রকম অসংখ্য খবর ও কাহিনি আছে আমাদের পরিবারগুলোর অভ্যন্তরে। হুমায়ূন সেই লুকানো কাহিনি ও লজ্জাকে উন্মুক্ত করেছেন *নন্দিত নরক* উপন্যাসে। মানুষ যে অতল রহস্যের আঁধার, তার কামতাড়না, তার উন্মুখ আকাঙ্ক্ষা যে শাস্ত্রধর্ম নৈতিকতা নিয়ন্ত্রিত নয় হুমায়ূন সে কাহিনিই তুলে ধরেছেন ক্ষুদ্র এই উপন্যাসে। সব মানুষেরই কিছু দুর্বলতার ছিদ্র থাকে—সেই ছিদ্র পথেই একদিন ঢুকে পড়ে ঊষর-এর উপায়ন অগোচরে এবং সে একদিন ফেঁসে যায় সেই বিতংসে। অশ্লীল অথচ অশ্লীল নয় এমন সম্পর্ক গোপন রাখতে যেয়ে গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে গেলে ফেঁসে যায় রাবেয়া, মাস্টার কাকা, মন্টু তথা গোটা পরিবারটাই। একটা শান্ত-শিষ্ট পরিবার, বলা যায় সুখীই পরিবার, সোনালি দিনের মুখোমুখি আসা পরিবার একটা একান্ত পারিবারিক ঘটনার আবর্তে পড়ে কীভাবে এলোমেলো দিশেহারা হয়ে সর্বনাশা ঘোলে ডুবে গেল, খুব ধীরলয়ে মধু বিষে পরিণত হলো, হুমায়ূন শিল্প রুচির সকল শর্ত বজায় রেখে তার বৃত্ত মোচন করেছেন। বোঝা গেল আমাদের সংসারে বিশ্বাসের কোনো জায়গা নেই, সম্পর্কের কোনো স্থিরতা নেই, স্নেহ ও শ্রদ্ধার কোনো মূল্য নেই আমাদের চেহারার সবটাই মুখোশ, সবার আস্তিনের নীচে লুকানো আছে

বিষলক্ষার ছুরি। সুযোগ পেলেই তা আমূল বসে যাবে আমাদের বুকে। ইউদিপাস কমপ্লেক্সের বিকৃত ক্ষুধা যে ছিল এবং আছে তা আর একবার প্রমাণ হলো মাস্টার কাকার কর্মে। অবুঝ, অসুস্থ, বিকল রাবেয়া হলো তার নির্মম শিকার। আর এ লজ্জা লুকাতেই জীবন দিতে হলো রাবেয়াকে। জীবন দিতে হলো সাধু বেশি ভণ্ড মাস্টার কাকাকে এবং নিরাপরাধ প্রতিবাদী যুবক মন্টুকে। একটি দুর্বল মুহূর্তের অপরাধে এক সংসারের তিনটি মূল্যবান জীবন বলি হয়ে গেল দেখতে দেখতে। খোকাদের অনেক স্বপ্নের সাজানো সংসারটা একটু ঝড়ে তছনছ হয়ে গেল। এই অভাবনীয় পরিণতির কোনো শুশ্রূষা নেই, সান্ত্বনা নেই, অথচ তা ঘটে যায় আমাদের অপরিণামদর্শী লিবিডো তাড়নায়। এই ক্ষুধা অপরাধ নয়, অপরাধ এর বিকৃত হিংস্র মূর্তির। যতদিন না মানুষ রুচিবান হবে, সভ্য-সুশীল হবে, মানব-মনীষায় প্রদীপ্ত হবে, মনুষ্যত্বের বেদীতলে বিনত হবে—ততদিন আমাদের মোহমুক্তি নেই, নিস্তার নেই, ততদিন *নন্দিত নরকে* চলতে থাকবে আমাদের বসন্ত ঋতু। এই সত্যকে শিল্পিত করে হুমায়ূন রচনা করেছেন তার *নন্দিত নরকে।*

উপন্যাসটির এক মুঠো কাহিনি এরকম। বাবা-মা, দুই ভাই, দুই বোন ও এক চাচা মিলে একটি মধ্যবিত্ত অসচ্ছল পরিবার। বড়ো মার মৃত্যুর পর সাত জনের সংসারটি সুখে-দুঃখে নিরুপদ্রব কেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো সংসারটা কাঁপিয়ে জানা গেল বড়ো মেয়ে অপ্রকৃতিস্থ রাবেয়া কুমারী অবস্থায় মা হতে চলেছে। দুশ্চিন্তায় সবার ঘুম হারাম হয়ে গেল। কিন্তু কিছুতেই উদ্ধার করা সম্ভব হলো না কে এই পাপের জন্য দায়ী। রাবেয়া নীরব, নির্বিকার শুধু হাসে। এ অবস্থায় বাবা গোপনে সিদ্ধান্ত নেয় অ্যাবরশনের। নিজ হাতে ওষুধ খাইয়ে বাড়িতেই গর্ভপাত ঘটালেন রাবেয়ার বাবা। আর তাতেই অতিরিক্ত রক্তপাতে মৃত্যু ঘটে রাবেয়ার। মাস্টার কাকা শহর থেকে বড়ো ডাক্তার নিয়ে এসেছে। সংবাদ পেয়ে হোস্টেল থেকে ছুটে এসেছে ছোটো ছেলে মন্টু। সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। চাপা কান্নায় ভারী হয়ে উঠেছে বাড়ির আকাশ-বাতাস। তখনই মন্টু কেউ কিছু বোঝার আগে একটা বটি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে মাস্টার কাকাকে। পুলিশ আসে। বিচারে মন্টুর ফাঁসি হয়। কিন্তু মন্টু পুলিশ ও আদালত কোথাও বলেনি কেন সে কাকাকে হত্যা করল। শুধু বলেছিল তার বড্ড রাগ। মন্টুর জন্য সবার বুকটা কাঁদে। লেখক বলছেন, 'তিথিরময়ী দুঃখ। প্রগাঢ় বেদনার অন্ধকার আমাদের গ্রাস করছে। বাইরে গাছের পাতায় বাতাস লেগে হা হা হা হা শব্দ উঠল।' (পৃ. ৫৯) কিংবা 'আমি বাবার হাত ধরলাম। কি শীতল হাত। বাবা থর থর করে কাঁপছেন। আমাদের মাথার উপরের ঝাঁকড়া গাছ থেকে আচমকা অসংখ্য কাক কা কা করে ডেকে জেলখানার উপর দিয়ে উড়ে গেল।' (পৃ. ৬৪) এ রকম শীতল, শুশ্রূষাহীন, শূন্যগর্ভ এক জীবনবোধের বিরামহীন মাঠ পার হতে হতে শেষ হয় *নন্দিত নরকের* কাহিনি।

মধ্যবিত্তের প্রায় অচল, অচঞ্চল ধূসর একটা পরিবারের মতো শুরু হয় এই উপন্যাসের মন্থর যাত্রা। অনেকটা কলুর ঘানির

মতো ধীর কষ্টকর তার গতি। কোথাও এর উজ্জ্বল রং নেই, প্রফুল্ল রূপ নেই, ছন্দ অসংলগ্ন। ভাঙা রেকর্ডের মতো বেজে চলে পরিবারটির মা, বাবা, পুত্র-কন্যা ও মাস্টার কাকার কথোপকথন। খোকার এমএ পাস ও চাকরির আশায় সবাই রঙিন স্বপ্ন দেখে। চলে রাবেয়ার বিয়ের প্রস্তুতি ও রোগ সারানোর নানারকম প্রচেষ্টা। খোকা বাড়ির পাশের শীলুকে নিয়ে ঘুমহীন রাত কাটায়। রুনু যৌবনাবতী হচ্ছে। 'যৌবনের সেই লুকানো চাবি দিয়ে প্রকৃতি একটি একটি করে অজানা ঘর খুলে দিচ্ছে তার সামনে।' (পৃ. ৩৩) তখনই পলার (পোষা কুকুর) হারিয়ে যাওয়া এবং হাস্নাহেনা গাছের নীচে মন্টুর একটা মস্ত বড়ো চন্দ্রবোড়া সাপ মারার সংবাদটি যেন এই উপন্যাসের এক অশনি সংকেত বহন করে। ভীতি, শঙ্কা, অনিশ্চয়তা, আর মৃত্যুর মতো দুর্বিষহ কষ্টে কান্নায় ভারী হয়ে ওঠে কাহিনির পরিবেশ। সঙ্গে সঙ্গে মায়ের জ্বর, রাবেয়ার বাড়াবাড়ি পাগলামী এবং ঘুম ঘোরে করুণ কান্না, রুনুর কবিতা লেখা, খোকার স্বপ্নবিলাস, মা-বাবার সুখ-দুঃখের দিনরাত্রি, মাস্টার কাকার রহস্যময় ইনট্রোভার্ট জীবন ও মন্টুর একস্ট্রোভার্ট জীবন, নাহার ভাবীর ঘর থেকে উঁচু স্বরে রেকর্ড বাজা 'বিধি ডাগর আঁখি যদি দিয়েছিলে'-এ রকম বিভিন্ন বৈপরীত্য ও দুঃখ-কষ্টের

বিষাদবাতাসে উপন্যাসটির গতি অন্তর্মুখী হয়ে ওঠে। কাহিনি নানাভাবে লম্বা হতে থাকে কিন্তু গতি বাড়ে না, নাটকীয় কিন্তু মুহূর্ত এসেও উপস্থিত হয় কিন্তু নাটক জমে না, ভোরের ফোটা ফুলগুলো দুপুরের আগেই ঝরে যেতে থাকে, প্রকৃতিতে রং ধরে কিন্তু সে রং হয়ে যায় নীল, ধূসর, বা পীত বর্ণের—সব মিলে উপন্যাসটি সেই পরিণতির দিকে এগিয়ে যায় শস্যশ্যামল বনভূমি ছেড়ে ঊষর লাল মরুভূমির দিকে।

উপন্যাসের কোথাও যেন কোনো সুসংবাদ নেই। কর্মহীন, অলস, এক ঘেয়েমি সময় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে। গল্প এগোতে চায় না। মাঝে মাঝে মেঘের ছায়া, স্মৃতি আর অন্ধকারের হানা। কোনো ঘটনা বা চরিত্র মনে দাগ কাটে না। কাটলেও বালুকা বেলার উপর দাগ কাটার মতো ক্ষণস্থায়ী। রাবেয়াদের পরিবার ছাড়া শান্তি কটেজের আজিজ সাহেব, শীল, শীলুর মা-বাবা-ভাই, পাশের বাড়ির নাহার ভাবী, হারুণ ভাই, খোকার বন্ধু রমিজ, আশফাক, মন্টুর সহপাঠী ইয়াসমিন, বড়ো খালা, মিনা, ওভারশিয়ার কাকু, মাস্টার কাকার ভাই, দারোগা, পুলিশ, বিচারক, দারোয়ান—এরা কেউ যেন কোনো চরিত্র না, একেকটা টাইপ বা নম্বর মাত্র। সবাই ফ্রেমে বাধা গতানুগতিক চরিত্র। এরা শুধু আছে লতা-পাতা আর কাঁটার মতো। গল্পের মধ্যে এরা আছে একটা হাওয়া বা স্রোতের মতো অস্থায়ী। যে টুকু গল্প সেটা রাবেয়াকে ঘিরে পল্লবিত।

হুমায়ূন আহমেদ কঠিনকে সহজ করে বর্ণনা করেন। জটিলকে করেন দ্রবণীয়। আর দুঃখ, যন্ত্রণা, মর্মান্তিককে করেন ব্যথিত মধুর। পাঠক তাই খুব সহজে প্রবেশ করে তার গল্পের বৃত্তে। অথচ কামু, কাফকা কিংবা জয়েসের হাতে এই কাহিনিই হয়ে উঠত দুর্বোধ্য, অগম্য, কুঞ্জিপ্রস্তর এক নির্মাণ শৈলী। ফ্লবেয়ার, কমলকুমার কিংবা ইলিয়াসের হাতে পড়ে তা হয়ে যেত নিরালোকের গোলক ধাঁধাঁ। কিন্তু হুমায়ূন বাঙালি পাঠকের মন জানেন, স্বভাব জানেন, প্রবৃত্তির পুরাণ জানেন। তাই সুন্দরকে তিনি আলোকিত করেন, প্রেমকে করেন কুণ্ঠিত, ভালোবাসাকে লজ্জিত। অভাব-দারিদ্র্যকে করেন কষ্টিত, আঘাতকে ব্যথিত। ভালোবাসেন নিঃসঙ্গতা, বিষণ্নতা, উদাসী হাওয়া। খুব স্বাপ্নিক বলে আবিষ্ট থাকেন এক ধরনের রোমান্টিক বিষাদে। মানুষ তার খুব প্রিয়—হোক সে আধা বা উনো। বালকসুলভ চপলতায় তার আনন্দ। উয়িট ও হিউমারে তার প্রবল কৌতূহল। বাঙালি পাঠককে প্রাণিত করার এইসব উপকরণ পরিবেশনে হুমায়ূন সিদ্ধহস্ত। সে জন্যই তিনি এত নন্দিত।

মেঘের আড়ালে থাকা মন্টুর এই উপন্যাসে আগমন ধূমকেতুর মতো উজ্জ্বলতায়। কোমল, কুহেলি, সংরাগ সুরে সংক্রমিত উপন্যাসটির গর্ভ ছিঁড়ে মন্টুর আবির্ভাব সাহসী, উন্নাসিক, ইস্পাত দৃঢ়। কাকা যার ভাগ্যগুণে তার মাকে বলেছিল, 'ছেলে বুদ্ধিমান, সাহসী শক্তিমান আর প্রেমিক। সৌভাগ্যবান ছেলে আপনার তাকে একটা গোমেদ পাথর দেবেন বুবু (পৃ. ৫৭) পাথর দেওয়া হয়নি বলে কি মন্টু বিপদ এড়াতে পারল না? যে মন্টু নির্ভিক-চিত্তে চন্দ্রবোড়া সাপ মারতে পারে, সেই তো সাপরূপী মাস্টার কাকাকে খুন করতে পারে। মন্টুর নার্ভ বরাবর শক্ত বলেই সে দারোগার সামনে, বিচারকের সামনে এতটুকুও ঘাবড়ে যায় না। এমন কী প্রেমিক ইয়াসমীনের কথা তুললেও সে থাকে নির্বিকার 'ও ইয়াসমীন, আমার সঙ্গে পড়ে। এটুকুই।' জীবন জগতের উপর তার খুব রাগ, কিন্তু পরিবার পরিজনের উপর কোথায় যেন একটা দুর্বলতা আছর করে আছে। তাই সে মারামারি করে জামা ছিঁড়ে গাছে বসে থাকে বাড়ি ফিরবে না বলে, ফিরবে যদি ভাইয়া এসে তাকে নামিয়ে নিয়ে যায়। ফাঁসি হবে জেনে জেলখানায় বিদায়ের আগে তাই সে ভালো খাবার খেতে চায় না ইয়াসমিনের প্রসঙ্গও এড়িয়ে যায়, শুধু সমস্ত আবেগ উৎসারিত করে বলে, 'তোমাদের আমি বড়ো ভালোবাসি দাদা'। এমন এক নিষ্ঠুর হৃদয়বান চরিত্র আঁকেন হুমায়ূন।

কাহিনির শুরুটা ছিল প্রকৃতিগতভাবে ছোটোগল্প মেজাজী। সেখান থেকে উপন্যাসের যাত্রাপথে তা এগোচ্ছিল কিছুটা এলোমেলো অগোছালো বিলম্বিত ছন্দে। মেদহীন একান্ত সেই ঘরোয়া কাহিনিটি শেষের দিকে এসে জড়োয়া পরে হয়ে ওঠে সুসংহত। আত্মরতির সূক্ষ্ম সংকীর্ণ পথ পরিহার করে যাত্রা করে সামঞ্জস্যপূর্ণ সমগ্রের শিল্পের দিকে। মাস্টার কাকার হত্যার মধ্য দিয়ে কাহিনির নানা শাখা-প্রশাখা, পথ-ঘাট পরিচিতি পাল্টে গেল। কক্ষচ্যুত হলো যে যার কক্ষ থেকে। নদীর এখন একটাই গতি গন্তব্যমুখী। রাবেয়া ও কাকার মৃত্যু, মন্টুর ফাঁসি উপন্যাসের সমস্ত অনৈক্য, অন্ধকার, দূরায়ত আলোকে একট লক্ষ্যে উপনীত করে—মানুষ বড়ো আপন, সম্পর্ক বড়ো নিবিড়, সুখ নয় শোকই মানুষের বিভেদকে ঐকতান দেয়, এক সুরে বাঁধে। মন্টুর ঘরে তালা। তার লেখা দিন যায়, দিন যায় শুধুই স্মৃতি এবং নীরবতা। 'বাবা গোঙানির মতো শব্দ করে কাঁদেন'। 'রুনুর অবুঝ প্রশ্ন মরার পর কি হয় দাদা?' অপরূপ জ্যোৎস্না। হাসনাহেনার গন্ধে নাহার ভাবী মৃদু ভল্যুমে গান শোনায় 'বিধি ডাগর আঁখি' প্রিয় পলার কথাও মনে পড়ে যায়, মনে পড়ে রাবেয়ার কিছু পাগলামী, সুর করে কোরান শরীফ পড়া মায়ের কথা—এইসব নান্দনিকতা, রোমান্টিকতা, তিমিরবিদারী দুঃখ, রিক্ততা পরিবারটিকে গাঢ়, নিবিড় ও যূথবদ্ধ করে। কিন্তু তা নিয়ে কোনো বাড়াবাড়ির চেষ্টা নেই, বর্ণনার ঘনঘটা নেই, রং লাগানোর পাঁয়তারা নেই—এক কথায় লেখকের ডিটেলে থাকার কোনো উৎসাহ নেই, ওজস্বিতা নির্মাণের আয়োজন নেই। সব কিছুই বড়ো সংক্ষিপ্ত, সঙ্কেতায়িত। এখানেই উপন্যাসটির শৈলী ও শিল্পসৌন্দর্য সৃষ্টির সার্থকতা।

হুমায়ূন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত অতি আধুনিক যুগের মানুষ। নির্বেদ, নিঃসঙ্গতা, নিরবলম্বতায় তাই তার আশ্রয়। সত্য অপেক্ষা নিষ্ঠুর সৌন্দর্যে তার অধ্যাস। তাই এই উপন্যাসের সব বিপর্যয়ে কারো কোনো রাষ্ট্রীয়, সামাজিক বা জাতি-ধর্মের দায় নেই। এখানে ব্যক্তি মুখ্য, গোষ্ঠী গৌণ। তেমনি বাস্তববাদ গৌণ, অস্তিত্ববাদ মুখ্য। তাই উপন্যাসটির কোনো চরিত্র দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র, জনভূমিষ্ঠ শিকড় ধরে বিকশিত হয়নি। এ উপন্যাস একান্ত এ যুগের পরিবার প্রথাকে ধরে রাখার একটি কষ্টিত চেষ্টা

মাত্র। যা আজ এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে পরিণত। এই উপন্যাসের কেন্দ্রভূমিতে যে সুখ স্বপ্নে বিভোর মধ্যবিত্ত পরিবারটির অবস্থান, তা গোটা বাংলাদেশের শিক্ষিত শহুরে মধ্যবিত্ত পরিবারেরই একটি বাস্তবতার চিত্র। যে শ্রেণিটির জীবনযাপনের একমাত্র উপায় শিক্ষা ও চাকরি। শিক্ষা যার পুঁজি আর চাকরি যার বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান। ভূমির সঙ্গে যাদের সম্পর্ক ক্ষীণ, বাণিজ্যের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক ভীতির। এরা হাঁটে নীচ দিয়ে কিন্তু তাকিয়ে থাকে উপরের দিকে। যা তারা চায় ভুল করে চায়, আর যা পায় তা চায় না। এদের বসবাস রোমান্সের সঙ্গে, প্রতিযোগিতা কল্পিত মূর্তির সঙ্গে। তাই এরা ধাক্কা খায় বেশি, আহতও হয় বেশি। তবু সুখের সিঁড়ি ভাঙার প্রাণান্ত চেষ্টা চলে। *নন্দিত নরকে* তাই হয়ে ওঠে বাঙালি শিক্ষিত শহুরে মধ্যবিত্ত ক্রমবিকাশমান কামনা ও এষণার প্রতীক। এই পরিবারটির সমস্ত চিত্র ও চরিত্র, স্বপ্ন ও কল্পনা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা, রোমান্স ও সকরুণ পরিণতি এ দেশের এমনতর লাখো পরিবারেরই জীবনচরিত বা আত্মচরিত। আমাদের মধ্যবিত্ত প্রতিটি পরিবারে মন্টুর মতো বীর আছে আবার খোকার মতো কাপুরুষ আছে। রাবেয়ার মতো অপ্রকৃতিস্থ কোনো না কোনো মেয়ে আছে আবার রুনুর মতো প্রজাপতি-মন মেয়ে আছে। সর্বোপরি কুণ্ঠিত মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর একটা শ্রীহীন সমস্যা— এদের কোনো Private life নেই। Privacyও বিঘ্নিত পদে পদে। অথচ জীবনযাপনের জন্য প্রত্যেকের জন্য এটা অতীব জরুরি। হুমায়ূন খুব সূক্ষ্ম ও শিল্পিতভাবে এই মেসেজটি আমাদের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেন খোকার যাপিত জীবনের রিয়ালিটির মাধ্যমে। খোকার ব্যক্তিবিশ্ব বার বার বিড়ম্বিত হয়েছে রুনু, রাবেয়া, বাবা-মা ও মাস্টার কাকার মাধ্যমে সংসারের টানাপড়েনে উপায়হীনভাবে একই ঘরে শুতে হয় খোকা, রুনু ও রাবেয়াকে। আমার পাশেই রাবেয়া আর রুনু শুয়ে আছে। এত পাশে যে হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। (পৃ. ১৩) কিংবা পাশের ঘর সেখানে বাবা-মা থাকেন, তার মাঝখানে মাত্র একটা বাঁশের বেড়ার ব্যবধান। বেড়ার উপরটা চাল থেকে দু'হাত ফাঁকা। অর্থাৎ আব্রুটা প্রায় অনাবৃত। বাবা শাহানা নামের মাকে মধ্যে আদুরে গলায় ডাকেন শানু-শানু। তারপর 'আমি একটা চুমুর শব্দ শুনলাম' (পৃ. ১১) গভীর রাতে মাস্টার কাকার খট্ খট্ খড়মের শব্দে খোকার ঘুম নষ্ট হয়েছে। এভাবে তার ব্যক্তিগত একান্ত জীবনকে বিঘ্নিত করেছে পরিবারের সদস্যরা। তাতেই সে ইনসমনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়। অস্থির হয়েছে লিবিডোর তাড়নায়। তাই সে টমাস হার্ডির 'এ পেয়ার অব ব্লু আইস' নামক প্রেমের গল্পটি শোনাতে চায় রুনুকে লজ্জায় শোনাতে না পারার কষ্টটা এভাবে সে ব্যক্ত করে, 'হয়তো আমাকে তার সত্যি ভালো লাগে। বাইরে তীব্র জোছনা, ফুলের অপরূপ সৌরভ, মশার উড়িয়ে নেবার মতো বাতাস। বুকের কাছটায় গভীর বেদনা অনুভব করি।' (পৃ. ১৭) এভাবেই গোপনে আমাদের মধ্যে পবিত্র পাপের জন্ম হয়। যে পাপ করেছিল 'ললিতা'র নায়ক, যে পাপ করেছিল ' ফুলবউ'র নায়ক। এমন বাস্তব ভাবাও পাপ কিন্তু সত্য এমনই নির্মম যে সে কাহিনিকেও

চিরকাল হার মানিয়ে দেয়। রাবেয়া ও মাস্টার কাকার সম্পর্ক সেই নিষ্ঠুর রিয়ালিজমের প্রস্তর স্বাক্ষর। মধ্যবিত্তের শিক্ষা সংস্কৃতির যত প্রসার ঘটছে মধ্যবিত্ত ততই সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্ম-স্বার্থপর হয়ে উঠছে। ধ্বংস হচ্ছে তাদের মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও আদর্শের অস্বীক্ষা। সে যে কত ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে *নন্দিত নরকের* ইতিহাস ও আত্মজীবনীতে রচিত হয়েছে তার অপরাধ ও শাস্তির শৈল্পিক অভিজ্ঞতা।

নন্দিত নরকে এই অদ্ভুত সুন্দর নামটি দেখেই মজে ছিলেন ড. আহমদ শরীফ। আর বাঙালি পাঠক শুধু নামে নয়, গল্পেও মজলেন। তার রুচি, তার অভিনিবেশ, তার রস ও রূপ এবং জীবনের আদ্যন্ত অভ্যাসেও মজলেন পাঠক। শরতের পর পাঠক এমন করে আর কারো গল্প পুরাণে মজেনি কোনোদিন, কোনোকালে। মধ্যবিত্তের সীমানায় তার প্রিয় অধিবাস। মধ্যবিত্ত মানুষের মানসিকতা ও প্রিয় ধ্যান-জ্ঞান। মধ্যবিত্তই তার সৃষ্টির বীজতলা, শিল্পের জাদু আয়না। স্বাধীনতা উত্তর নতুন সমাজবাস্তবতায় সেই শ্রেণিটি কোন লক্ষ্যে অগ্রসর হচ্ছিল, তার চরিত্র কী রূপ ধারণ করেছিল, কীভাবে তাদের ঐতিহাসিক ঐতিহ্য ইতিহাসের এই কালপর্বে এসে ভূমিকাটি ম্লান ও ম্রিয়মাণ হয়ে উঠছিল *নন্দিত নরকে* তারই সদ্য গর্ভধারণ করা এক বিষাক্ত ভ্রূণ।

গাজী আজিজুর রহমান: সাবেক অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কালিগঞ্জ সরকারি কলেজ, সাতক্ষীরা

জাতীয় আয়কর দিবসের গুরুত্ব

এম এ খালেক

৩০শে নভেম্বর 'জাতীয় আয়কর দিবস।' অন্যান্য বছরের মতো ব্যাপক উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে জাতীয় আয়কর দিবস। প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জাতীয় আয়কর দিবস সংশ্লিষ্ট আয়কর দাতাদের মাঝে প্রচণ্ড আগ্রহের সৃষ্টি করে। এবারের জাতীয় আয়কর দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, 'building an equitable and sustainable economic system.' সময়ের প্রয়োজন বিবেচনায় প্রতিপাদ্য বিষয়টি ছিল অত্যন্ত যৌক্তিক এবং উপযোগী। একবার জাতীয় আয়কর দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছিল, 'সবাই মিলে দেব কর, দেশ হবে স্বনির্ভর।' আসলে জাতীয় আয়কর দিবস পালনের মূল উপলক্ষ্যই হচ্ছে করদাতাদের মাঝে আগ্রহ এবং সচেতনতা সৃষ্টি

করা, যাতে তারা যথাযথভাবে আয়কর প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণে আগ্রহী হয়। জাতীয় আয়কর দিবস পালনের মাধ্যমে জনগণকে আয়কর প্রদানের গুরুত্ব বুঝানোর চেষ্টা করা হয়। যে-কোনো সরকারের উদ্দেশ্য থাকে বিভিন্নভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পাদন করে জনগণের জন্য সুখ এবং সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা। এছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনায় সরকারের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। জনগণের নিকট থেকে নানা প্রক্রিয়ায় রাজস্বের আকারে অর্থ আদায় করে উন্নয়ন ও প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহ করা হয়। রাজস্বের একটি উপকরণ হচ্ছে আয়কর।

মুক্তবাজার অর্থনীতিতে ব্যক্তির সৃজনশীলতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়। রাষ্ট্র বা জনস্বার্থে ক্ষতিকর নয় এমন যে-কোনো উৎপাদনশীল কাজে স্বীয় মেধা ও সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তি তার অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করতে পারেন। রাষ্ট্র তাকে সর্বতোভাবে সহায়তা করে থাকে। ব্যক্তির যে-কোনো আয়বর্ধক উৎপাদনশীল কাজে রাষ্ট্রের সহায়তার প্রয়োজন হয়। এই সহায়তা সবার জন্য একই রকম হয় না বা সবাই রাষ্ট্র প্রদত্ত সহায়তা একইভাবে গ্রহণ বা ভোগ করতে পারেন না। যেমন কোনো এলাকায় একটি পাকা রাস্তা তৈরি হলে সেই রাস্তা দিয়ে সবাই হেঁটে যেতে পারেন। কিন্তু সবার ব্যক্তিগত গাড়ি থাকে না, তাই চাইলেই সবার পরিবহণ সুবিধা ভোগ করতে পারেন না। অথচ এই রাস্তা নির্মাণের জন্য বিত্তবান-বিত্তহীন উভয় শ্রেণির মানুষের দেওয়া ট্যাক্সের অর্থ ব্যয় করা হয়। যেহেতু ব্যক্তিগত গাড়ির মালিক রাস্তা ব্যবহার করে বিত্তহীন মানুষের চেয়ে বেশি সুবিধা ভোগ করেন তাই তার উপর এক ধরনের 'দায়' আরোপিত হয়। কর প্রদানের মাধ্যমে ব্যক্তি তার সেই 'দায়' পরিশোধ করে থাকেন। ট্যাক্স বা কর প্রদান এই দায় পরিশোধের এক ধরনের পন্থা মাত্র।

করারোপের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ জনকল্যাণে ব্যবহৃত হয়। এতে দারিদ্র্য বিমোচন ও বৈষম্য নিরসনে সহায়ক হয়। সরকার রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে জনগণের নিকট থেকে করারোপের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে তা জনকল্যাণে ব্যবহার করে থাকে। যেসব উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পাদন করা হয় তার সুবিধাভোগী রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক। আয়কর আরোপের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তুলনামূলক বিত্তবান নাগরিকদের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তা দরিদ্র মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করা। ইসলামিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় জাকাতের বিধান রয়েছে। আল্লাহর দেওয়া সম্পত্তি ব্যবহার করে এক শ্রেণির মানুষ বিত্তবৈভব অর্জন করে। সেই সম্পত্তিতে সাধারণ দরিদ্র মানুষের 'হক' বা অধিকার থাকে। জাকাত প্রদানের মাধ্যমে বিত্তবান মানুষগণ তাদের দায়বদ্ধতা থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি পায়। আয়করকে ঠিক সেভাবেই মূল্যায়ন করা যেতে পারে। রাষ্ট্রের দেওয়া সুবিধা সবাই একই মাত্রায় ভোগ করতে পারেন না। যারা বেশি সুবিধা ভোগ করেন তারা আয়কর প্রদানের মাধ্যমে সেই দায় কিছুটা হলেও পরিশোধ করে থাকেন। সঠিকভাবে রাজস্ব আদায় করতে না পারলে একটি দেশ কখনোই উন্নত হতে পারে না। বিশ্বে এমন একটি দেশের দৃষ্টান্তও দেখানো যাবে না যারা রাজস্ব সঠিকভাবে আদায় না

করেই জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে সক্ষম হয়েছে। বিভন্ন ফর্মে রাজস্ব আদায় করা যেতে পারে। এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হচ্ছে আয়কর।

একটি দেশ কতটা উন্নত এবং সভ্যতার শিখরে আরোহণ করেছে তা নির্ণয়ের একটি সহজ পন্থা হচ্ছে রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা, বিশেষ করে আয়কর প্রদানের হার প্রত্যক্ষ করা। উন্নত দেশের জনগণ স্বপ্রণোদিত হয়ে আয়কর প্রদান করেন। আয়কর প্রদানকে তারা নৈতিক দায়িত্ব এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন এবং দেশপ্রেমের অংশ বলে মনে করেন।

দাক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ট্যাক্স-জিডিপি রেশিও'র ক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কার অবস্থান সবার নীচে। তাদের ট্যাক্স-জিডিপি রেশিও হচ্ছে ৭ দশমিক ৪। কর-জিডিপি রেশিওর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান শ্রীলঙ্কার ঠিক উপরেই। বাংলাদেশের ট্যাক্স-জিডিপি রেশিও হচ্ছে ৭ দশমিক ৫ শতাংশ। জাপানের ক্ষেত্রে ট্যাক্স-জিডিপি রেশিও হচ্ছে ৩৪ দশমিক ১শতাংশ, দক্ষিণ কোরিয়ায় ৩২ শতাংশ, চীনে ২০ শতাংশ, ভিয়েতনাম ১৯ শতাংশ, থাইল্যান্ডে ১৬ দশমিক ৭ শতাংশ, পাকিস্তান এবং ভুটানের ট্যাক্স-জিডিপি রেশিও হচ্ছে যথাক্রমে ১০ শতাংশ এবং ১১ দশমিক ৩ শতাংশ। বাংলাদেশের ট্যাক্স-জিডিপি রেশিও দিন দিনই অধঃপতনের দিকে যাচ্ছে। ট্যাক্স প্রদানের সামর্থ আছে অথচ অনেকেই ট্যাক্স প্রদান করেন না।

জাতিসংঘের রেটিং অনুযায়ী, বাংলাদেশ এবছর (২০২৬) উন্নয়নশীল দেশের চূড়ান্ত তালিকায় উত্তীর্ণ হতে যাচ্ছে। কোনো দেশই চিরদিন দরিদ্র দেশ হিসেবে থাকতে চায় না। স্বাধীনতা পরবর্তী দীর্ঘ ৫৫ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিস্ময়কর অগ্রগতি সাধন করেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো অর্জন হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশের চূড়ান্ত তালিকায় উত্তীর্ণ হওয়া। বিগত অর্ধ শতাব্দীতে বিশ্বের ৬ থেকে ৭টি দেশে স্বল্পোন্নত দেশের কাতার থেকে টেকসইভাবে উন্নয়নশীল দেশের চূড়ান্ত তালিকায় উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের চূড়ান্ত তালিকায় উত্তীর্ণ হবার বিরল সম্মান অর্জন করতে চলেছে। তবে এই অর্জনের জন্য আমাদের অনেক কিছু হারাতে হবে। স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত ২৭টি দেশের বাজারে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে শুল্ক মুক্ত জিএসপি সুবিধা পেত। উন্নয়নশীল দেশের চূড়ান্ত তালিকায় উত্তীর্ণ হবার পর বাংলাদেশ জিএসপি সুবিধা হারাবে। তখন আন্তর্জাতিক বাজারে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতায় নামতে হবে।

বাংলাদেশকে নিজস্ব উৎস থেকে অর্থ আহরণের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে রাজস্ব, বিশেষ করে আয়কর আদায় বাড়ানোর কোনো বিকল্প থাকবে না। কোনো দেশ যদি নিজস্ব সূত্র থেকে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ আহরণ করতে না পারে তাহলে তাকে বিদেশি ঋণের উপর নির্ভর করতে হয়। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশে গৃহীত বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ১০ হাজার কোটি মার্কিন ডলার অতিক্রম করে গেছে। আগামীতে চাইলেই বিদেশি ঋণ পাওয়া যাবে না। আর ঋণ পাওয়া গেলেও তার জন্য উচ্চ সুদ দিতে হবে। সেই অবস্থায় সবচেয়ে ভালো সমাধান হচ্ছে স্থানীয় সূত্র থেকে অর্থ আহরণের জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা। আমাদের ট্যাক্স-জিডিপি বাড়নো ব্যতীত কোনো গত্যন্তর নেই। প্রতিবছরই দেখা যায়, বাজেটে রাজস্ব আহরণের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় তা অনার্জিত থেকে যায়। ফলে উন্নয়ন কাজে অর্থায়নের জন্য বিদেশি ঋণের উপর নির্ভর করতে হয়। একটি মর্যদাবান দেশ কখনোই দীর্ঘ দিন বিদেশি ঋণের উপর নির্ভরশীল থাকতে পারে না। কারণ ঋণগ্রস্ত জাতির কোনো আত্মমর্যাদা থাকে না।

বাংলাদেশে যারা আয়কর বা অন্যান্য কর প্রদানের যোগ্যদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য জাতীয় আয়কর দিবসের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো আয়কর দিবস পালন করা হয় ২০০৮ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর। এরপর প্রতিবছরই আয়কর দিবস পালিত হয়ে আসছে। ২০১৬ সাল থেকে ৩০শে নভেম্বর জাতীয় আয়কর দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে। সাধারণত চাকরির আয়, বাড়ি বা দোকান ভাড়া, কৃষি খাত থেকে অর্জিত আয়, ব্যবসা থেকে উপার্জিত আয়, মূলধনী আয়, আর্থিক পরিসম্পদ থেকে আয়, ব্যাংকের দেওয়া সুদ বা লভ্যাংশ থেকে আয়, বিদেশে অর্জিত করযোগ্য আয় ইত্যাদি খাত থেকে কর আদায় করা হয়।

ধার্যকৃত আয়করের রকম ভেদ আছে। ৩ লাখ ৭৫ হাজার টাকার কম আয়কারী ব্যক্তির উপর কোনো কর ধার্য করা হয়নি। অন্যান্য ক্ষেত্রে যে আয়কর নির্ধারণ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

৩,৭৫,০০০/- থেকে ৬,৭৫,০০০/-টাকা আয়কারী ব্যক্তির উপর আরোপিত করের হার হচ্ছে ১০ শতাংশ।

৬,৭৫০০০/-থেকে ১০,৭৫,০০০/-টাকা আয়কারী ব্যক্তির উপর আরোপিত কর হার হচ্ছে ১৫ শতাংশ।

১০,৭৫,০০০/-থেকে ১৫,৭৫,০০০/-টাকা আয়কারী ব্যক্তির উপর আরোপিত কর হার হচ্ছে ২০শতাংশ।

১৫,৭৫,০০০/- থেকে ৩৫,৭৫,০০০/- টাকা আয়কারী ব্যক্তির উপর কর হার হচ্ছে ২৫ শতাংশ।

৩৫,৭৫,০০০ টাকার উপরে আয়কারী ব্যক্তির উপর আয়করের হার হচ্ছে ৩০ শতাংশ।

শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত এবং অতালিকাভুক্ত কোম্পানির উপর আরোপিত করের হারে ভিন্নতা রয়েছে। যেসব কোম্পানি শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত হয়েছে তাদেরে ক্ষেত্রে কর হার হচ্ছে ২৫ শতাংশ। আর অতালিকাভুক্ত কোম্পানির ক্ষেত্রে করের হার হচ্ছে ৩২ দশমিক ৫ শতাংশ। অতালিকাভুক্ত ব্যক্তিমালিকানাধীন কোম্পানিগুলোকে শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্তির বিষয়ে আগ্রহী করে তোলার জন্য কর হারের এই

পার্থক্য করা হয়েছে। সিগারেট কোম্পানির উপর ২ দশমিক ৫০ শতাংশ অতিরিক্ত করারোপ করা হয়েছে। নিবন্ধিত কোম্পানিগুলোর অধিকাংশই সঠিকভাবে ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল করে না। রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানি অ্যান্ড ফার্মসের রেজিস্ট্রিকৃত প্রাইভেট ও পাবলিক কোম্পানির সংখ্যা হচ্ছে ২ লাখ ৮৮ হাজার। ২০২৩-২০২৪ সালের মাত্র ২৪ হাজার ৩৮১ টি বা ৮ দশমিক ৪৫ শতাংশ কোম্পানি ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল করে। ২০২৫ সালে ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার (টিআইএন) ধারীর সংখ্যা ছিল ১ কোটি ১২ লাখ। এর মধ্যে মাত্র ৪৪ লাখ ৩০ হাজার টিআইএনধারী রিটার্ন দাখিল করেনি। অর্থাৎ বিভিন্ন প্রয়োজনে টিআইএন গ্রহণ করলেও তাদের অনেকেই নিয়মিত রিটার্ন দাখিল করেন না অর্থাৎ ট্যাক্স প্রদান করেন না। ট্যাক্স প্রদানযোগ্য অনেক ব্যক্তি আছেন যারা ট্যাক্স প্রদানের মর্মার্থ বুঝতে পারেন না। তাই তারা ট্যাক্স প্রদান করেন না বা ট্যাক্স ফাঁকি দেন। এদের মধ্যে সচেতনতা জাগ্রত করার একটি কৌশল হচ্ছে জাতীয় আয়কর দিবস পালন। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশেই ব্যক্তি আয়ের উপর কর প্রদানের বিধান রয়েছে। উন্নত দেশগুলোতে নাগরিকগণ সচেতনভাবেই আয়কর এবং অন্যান্য ট্যাক্স প্রদান করে থাকেন। কিন্তু আমাদের দেশের পরিস্থিতি খুব একটা ভালো নয়। অধিকাংশ মানুষ আছেন যারা সুযোগ পেলেই ট্যাক্স ফাঁকি দেন অথবা সঠিক মাত্রায় ট্যাক্স প্রদান করেন না।

ব্যক্তি আয়ের উপর প্রথম করারোপ করা হয় ১৮৬১ সালের ৫ই আগস্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। গৃহযুদ্ধের কারণে দেশটির অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সেই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য ব্যক্তি আয়ের উপর করারোপ করা হয়। ৬০০ মার্কিন ডলার থেকে ১০ হাজার মার্কিন ডলার আয়ধারীদের উপর ৩ শতাংশ হারে করারোপ করা হয়। যাদের আয়ের পরিমাণ ১০ হাজার মার্কিন ডলারের বেশি তাদের উপর ৫ শতাংশ হারে আয়কর ধার্য করা হয়। ব্যক্তি আয়ের উপর কর ধার্য করার মার্কিনী উদ্যোগ অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়। পরবর্তীতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশও ব্যক্তি আয়ের উপর কর ধার্য করে। বর্তমানে অধিকাংশ দেশের রাজস্ব আহরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে ব্যক্তি আয়কে বিবেচনা করা হয়। ব্রিটিশ আমলে ঊনবিংশ শতাব্দিতে উপমহাদেশের আয়কর আরোপ করা হয়। সেই থেকে এখনো পর্যন্ত আয়কর আদায় করা হচ্ছে।

আয়কর দিবস পালনের মাধ্যমে জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি যারা আয়কর ফাঁকি দিচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। আমাদের মনে রাখতে হবে, আয়কর কারো প্রতি রাষ্ট্রের জুলুম নয়। এটা রাষ্ট্রের এক ধরনের অধিকার। সেই অধিকার আদায় নিশ্চিত করতে হবে। দেশ যদি অভ্যন্তরীণ সূত্র থেকে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে না পারে তাহলে আগামীতে কখনোই আমরা আত্মনির্ভর জাতি হিসেবে বিবেচিত হতে পারব না। দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে কর প্রদানযোগ্য প্রতিটি নাগরিককে সঠিকভাবে কর প্রদান করতে হবে। আমরা আয়কর দিই, দেশের উন্নয়নে অংশগ্রহণ করি।

এম এ খালেক: অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ম্যানেজার, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পিএলসি ও অর্থনীতি বিষয়ক লেখক

বিডা ও সুইসকন্টাক্টের (Swisscontact) মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা সুইসকন্টাক্ট (Swisscontact)-এর মধ্যে ১৫ই অক্টোবর রাজধানীর আগারগাঁওস্থ বিডা সম্মেলন কক্ষে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ সহযোগিতার লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের বিনিয়োগ পরিবেশকে আরো শক্তিশালী করা এবং টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা। এ চুক্তির আওতায় তিনটি মূল লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে: প্রমাণনির্ভর বিনিয়োগ পরিবেশ বিশ্লেষণ ও সমন্বয় জোরদার; বিডাকে একটি বিশ্বমানের বিনিয়োগ প্রচার সংস্থা হিসেবে শক্তিশালী করা এবং খাতভিত্তিক বিনিয়োগ সম্প্রসারণ ও ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজের উন্নয়ন। বিডা দীর্ঘদিন ধরে দেশের বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করে আসছে। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি বিনিয়োগ নীতিমালা সংস্কার, সেবার ডিজিটালাইজেশন এবং বিভিন্ন সরকারি সংস্থার মধ্যে সমন্বয় জোরদারে কাজ করছে। অন্যদিকে, সুইসকন্টাক্ট বিডার সহযোগিতায় বাংলাদেশের বিভিন্ন পৌরসভায় ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ ও প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কাজ করেছে। এর ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠান দু'টি এখন নতুন একটি উদ্যোগ গ্রহণে সম্মত হয়েছে, যা বিডার 'হিট ম্যাপ' অনুযায়ী বিভিন্ন খাতভিত্তিক বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে সহায়ক হবে।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বিডা চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন বলেন, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ গঠনে সরকার নানামুখী সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সুইসকন্টাক্টের সঙ্গে এই অংশীদারিত্ব আমাদের 'ইনভেস্টর-ফার্স্ট' মডেল বাস্তবায়নের পথে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আমাদের লক্ষ্য হলো বিনিয়োগকারীরা যেন বাংলাদেশকে দক্ষ, সেবাবান্ধব ও সম্ভাবনাময় গন্তব্য হিসেবে অনুভব করেন।

বিডা ও সুইসকন্টাক্ট উভয় প্রতিষ্ঠানই আশা প্রকাশ করেছে, এই অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নতি ঘটবে, মানসম্পন্ন বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং টেকসই শিল্পায়নের মাধ্যমে অর্থনীতি আরো শক্তিশালী হবে।

প্রতিবেদন: জুয়েল মোমিন

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা: আমাদের ভবিষ্যৎ

রকিবুল ইসলাম

বর্তমানে খুবই আলোচিত ও ব্যাপক ব্যবহৃত একটি শব্দ AI। AI-এর পূর্ণরূপ Artificial Intelligence বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।

আমরা নতুন যে শিল্পবিপ্লবের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি তাকে বলা হচ্ছে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব। আর প্রযুক্তিনির্ভর এই ডিজিটাল বিপ্লবের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। বর্তমান পৃথিবী অনেকটাই এখন AI নির্ভর।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পরিচিতি

বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে যে বিষয়টি নিয়ে সর্বোচ্চ গবেষণা প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে তা হলো– যন্ত্রকে কীভাবে বুদ্ধিমত্তা প্রদান করা যায়। বুদ্ধিমত্তা বলতে আমরা বুঝি কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে ধারণা করতে পারা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারা, পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারা এবং তা কাজে লাগিয়ে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করা ইত্যাদি গুণের একটি সামগ্রিক রূপ। যার মধ্যেই উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো দৃশ্যমান থাকে, তাকেই আমরা বুদ্ধিমান হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হলো মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাশক্তিকে কৃত্রিম উপায়ে কম্পিউটার বা কম্পিউটার প্রযুক্তিনির্ভর কোনো যন্ত্রের মাধ্যমে বাস্তব রূপ দেওয়ার একটি ব্যবস্থা। এটি কম্পিউটার বিজ্ঞানের একটি অনন্য শাখা যেখানে মানুষের চিন্তাভাবনা ও বুদ্ধিমত্তাকে কম্পিউটার প্রোগ্রামের মাধ্যমে অনুকরণ ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

সুতরাং আমরা বলতে পারি– কৃত্রিম উপায়ে যন্ত্রকে বুদ্ধিমান বানানোর এই প্রযুক্তিই হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার শুরু

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন আলোড়ন সৃষ্টিকারী 'ChatGPT' অ্যাপ্লিকেশনটি চালু হওয়ার পর থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে তুমুল আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে এর চর্চা কিন্তু শুরু হয়েছে আরও অনেক আগে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন কম্পিউটার বিজ্ঞানী জন ম্যাকার্থি (John McCarthy) ১৯৫৫ সালে। এজন্য তাকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জনক বলা হয়। তারও আগে ১৯৫০ সালে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও গণিতবিদ অ্যালান টুরিং (Alan Turing) কোনো যন্ত্রের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যাচাই করার জন্য একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেন, যা 'টুরিং টেস্ট (Turing Test)' নামে পরিচিত। মূলত তখন থেকেই শুরু হয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে গবেষণা।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও যন্ত্র শিখন

মানুষ যেখানে কিছুক্ষণ কাজ করলে অথবা একই কাজ একটানা করলে ক্লান্ত হয়ে যায় সেখানে AI যন্ত্রের কোনো বিরতির প্রয়োজন হয় না। বরং তা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে একই কাজ নির্ভুলভাবে করে যেতে পারে। এখানেই মানুষের সাথে AI-এর সবচেয়ে বড়ো পার্থক্য।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি মূলত তার কাছে সংরক্ষিত পূর্ববর্তী তথ্যকে বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন সেবা প্রদান করে থাকে। এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন অ্যালগোরিদম ও যন্ত্র শিখন পদ্ধতির মাধ্যমে বিশাল তথ্য ভাণ্ডার বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন ফলাফল ও অনুমান জানিয়ে দেয়। তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হচ্ছে– আর্টিফিশিয়াল নিউরাল নেটওয়ার্ক (Artificial Neural Network-ANN), যা মানুষের শরীরের নিউরনের কার্যপ্রণালী অনুকরণ করে বিদ্যমান ডেটাকে প্রসেস করে জ্ঞানভিত্তিক কম্পিউটেশন মডেল তৈরি করে। তারপর সেই মডেল বিভিন্ন অজানা ডেটার ওপর প্রয়োগ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, নিউরাল নেটওয়ার্ক (Neural Network), যন্ত্র শিখন (Machine Learning), গভীর শিখন (Deep Learning), কম্পিউটার ভিশন (Computer Vision), স্বাভাবিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ (Natural Language Processing), জ্ঞানভিত্তিক পরিগণনা (Cognitive Computing) প্রভৃতি পদ্ধতি সম্মিলিতভাবে একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন যন্ত্র তৈরি করে থাকে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রযুক্তির মাধ্যমে কম্পিউটার বা যন্ত্রসমূহকে বুদ্ধিভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে পারদর্শী করে তোলা। যাতে তারা মানুষের কাজগুলো সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রযুক্তিগত ব্যবহার নিয়ে আলোচনা সাম্প্রতিক হলেও তার প্রয়োগ কিন্তু শুরু হয়েছে আরও অনেক আগে।

প্রকৃতপক্ষে মানুষ যেসব কাজ করে সেই কাজসমূহ তো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রযুক্তির মাধ্যমে করা হচ্ছেই। তাছাড়া, যেসব কাজ মানুষের দ্বারা করা কষ্টকর বা অসম্ভব, সেই কাজও কিন্তু প্রযুক্তিনির্ভর যন্ত্রসমূহ অনায়াসেই করছে।

ভারত কর্তৃক চাঁদে প্রেরিত চন্দ্রযান ৩-এর কথাই বিবেচনা করা যাক। সেখানে প্রেরিত তথ্য সংগ্রহকারী বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন রোবট। অপরদিকে চলমান রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে শত্রুপক্ষকে প্রতিহত করতে ব্যবহৃত হচ্ছে অত্যাধুনিক ড্রোনসমূহ যেগুলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে শত্রুপক্ষের সীমানায় নির্ভুলভাবে আঘাত হানছে।

বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানে এমন সব জটিল শল্য চিকিৎসা করা হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন রোবট দ্বারা যা মানুষের পক্ষে করা অসম্ভব। বড়ো বড়ো কলকারখানাগুলোয় পণ্যসমূহকে আনা নেওয়ার কাজে মানুষের পরিবর্তে ব্যবহৃত হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন যন্ত্র।

আধুনিক রেস্টুরেন্টগুলোয় খাবার অর্ডার নেওয়া থেকে শুরু করে ডেলিভারি পর্যন্ত সব কাজই করা হচ্ছে যন্ত্রের মাধ্যমে। এমনকি কৃষিক্ষেত্রেও এমন সব প্রযুক্তিনির্ভর যন্ত্রপাতির আগমন ঘটেছে, যা বীজ বপন থেকে শুরু করে ফসল কাটা পর্যন্ত সব কাজ করে দিতে পারে কোনো মানুষের সাহায্য ছাড়াই। প্রকৃতপক্ষে, শিক্ষা থেকে ব্যবসা এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ নেই।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে চাকরি

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির ক্রমাগত বিকাশের ফলে বর্তমানে যে বিষয়টি সবাইকে ভাবিয়ে তুলেছে তা হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কারণে কি বেকারত্বের পরিমাণ বেড়ে যাবে? সাম্প্রতিক কিছু পরিসংখ্যান এইক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। যেমন– অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষকের মতে, আগামী ১২০ বছরের মধ্যে মানুষ তাদের দৈনন্দিন সব কাজ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন যন্ত্রের মাধ্যমেই সম্পন্ন করতে পারবে।

জাপান, বাংলাদেশ, ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংবাদমাধ্যমগুলো সংবাদ উপস্থাপনের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন রোবটের প্রয়োগ ঘটিয়েছে, যা বেশ জনপ্রিয়তাও পেয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের নামকরা পত্রিকা ফরচুনের তথ্যমতে, বর্তমানে বিশ্বের প্রায় পাঁচ শতাধিক নামকরা প্রতিষ্ঠান তাদের কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আশ্রয় নিচ্ছে।

ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরামের সাম্প্রতিক একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী আগামী পাঁচ বছরে বিশ্বের শ্রম বাজার থেকে প্রায় ১ কোটি ৪০ লাখ চাকরি হারিয়ে যাবে। উপর্যুক্ত তথ্য বা পরিসংখ্যান ভীতি জাগানিয়া হলেও প্রকৃত সত্য হচ্ছে– চাকরি যেভাবে হারিয়ে যাবে একইভাবে নতুন নতুন চাকরির দ্বারও উন্মোচিত হবে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কারণে সেইসব চাকরিগুলোই ঝুঁকির মধ্যে পড়তে যাচ্ছে– যেখানে কায়িক শ্রমের প্রয়োজন বেশি হয়, চিন্তাশক্তি কিংবা বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন কম হয়। উদাহরণস্বরূপ- বিভিন্ন ধরনের ডেটা এন্ট্রি জব, কল সেন্টার জব, স্ক্রিপ্ট রাইটিং, কনটেন্ট রাইটিং, হিসাবরক্ষণ ইত্যাদি এবং দৈহিক শ্রমের কাজগুলো যেমন- কৃষিকাজ, পণ্য পরিবহণ ইত্যাদি।

বর্তমানে এইসব চাকরির জায়গাগুলোই ধীরে ধীরে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন যন্ত্রদ্বারা প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে, এইসব প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির সাথে সাথে কিন্তু নতুন নতুন চাকরিরও উদ্ভব হয়েছে। যদিও সেইগুলো সবই হচ্ছে প্রযুক্তিনির্ভর।

আগামী দিনগুলোয়, আমরা যেসব চাকরির ক্ষেত্রে মানুষের প্রাধান্য দেখতে পাবো তা হলো– কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিশেষজ্ঞ, তথ্য-নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ, তথ্য বিশ্লেষক, বিগ ডেটা বিশেষজ্ঞ, বাণিজ্য প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি। অর্থাৎ ধীরে ধীরে আমাদের কায়িকশ্রমের বাজারটি ক্রমাগতভাবে সংকুচিত হবে এবং প্রযুক্তিজ্ঞান সম্পন্ন, সৃজনশীল ও সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা সম্পন্ন মানুষের জন্য নতুন নতুন চাকরির দ্বার উন্মোচিত হবে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার হুমকি

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্রমাগত উন্নতির ফলে চাকরির বাজার সংকোচনের পাশাপাশি বর্তমানে যে বিষয়টি নিয়ে সবাই চিন্তিত তা হলো– মানুষ দ্বারা সৃষ্ট এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যন্ত্রগুলো কি ভবিষ্যতে মানব সভ্যতার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে?

নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী প্রত্যেকটি ক্রিয়ারই একটি সমান বা বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। ঠিক তেমনি, যে-কোনো কাজেরই ভালো ও খারাপ দুটি দিকই থাকে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির ক্রমাগত উন্নতির ফলে, মানুষের মতো সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রায় সক্ষম এমন যন্ত্র বিভিন্ন আঙ্গিকে তৈরি করে ফেলেছে। বর্তমানে যে জিনিসটি নিয়ে কাজ হচ্ছে তা হলো যন্ত্রকে কীভাবে মানুষের মতো আবেগ অনুভূতি প্রবণ করা যায়। আর এই বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জিত হলে প্রকৃতপক্ষেই তারা নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরাই নিতে সক্ষম হবে। ফলে মানুষের ওপর তাদের নির্ভরতা মোটেও থাকবে না। আর এ ধরনের একটি যন্ত্র ভুল নির্দেশনা পেলে তা একজন আবেগ অনুভূতিহীন বুদ্ধিমান মানুষ যতটা ভয়ংকর হতে পারে, তার চেয়েও বেশি ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে, যাদের ওপর মানুষের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। এই কারণে বিভিন্ন বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ এই ক্ষতিকর প্রভাব বিবেচনা করে এর ব্যবহার সীমিত করার ব্যাপারে অভিমত প্রকাশ করেছেন। বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং (Stephen Hawking) কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অপব্যবহারগুলো সম্পর্কে সতর্ক করে বলেছেন, এটি মানব সভ্যতার বিলুপ্তি ঘটাতে পারে।

গুগলের প্রধান নির্বাহী সুন্দর পিচাই (Sundar Pichai) মনে করেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অপব্যবহারগুলো সম্পর্কে আমাদের এখনই ভাবতে হবে এবং তার অপব্যবহার রুখতে প্রয়োজনীয় নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও এক্স-এর প্রধান নির্বাহী ইলন মাস্ক (Elon Musk)-এর মতে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই উন্নয়ন কোনো দৈত্যকে ডেকে আনার মতো।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভবিষ্যৎ

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্রমাগত উন্নতির সাথে সাথে মানুষ তার কায়িক শ্রমের কাজগুলো থেকে বেরিয়ে আসছে এবং এইসব কাজগুলো বিভিন্ন প্রযুক্তির মাধ্যমে করিয়ে নেওয়ার চেষ্টা অব্যাহত আছে। সামনের দিনগুলোয় যন্ত্রের এই প্রযুক্তিগত উন্নয়ন আরও বেগবান হবে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই অব্যাহত উন্নয়ন এক সময় মানুষের সক্ষমতাকেও ছাপিয়ে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ChatGPT-সহ এ ধরনের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন প্রযুক্তির ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। আবার অনেক দেশ নির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে এইসব প্রযুক্তি পণ্য ব্যবহারের জন্য অনুমতি প্রদান করেছে।

একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, অনেক বেশি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টাও বিপরীত ফল বয়ে আনতে পারে। কেননা আমরা দেখেছি, ক্রিপ্টোকারেন্সি (Cryptocurrency)-কে প্রচলিত লেনদেন ব্যবস্থায় যুক্ত না করার কারণে তা কিন্তু বন্ধ হয়ে যায়নি বরং তা ইন্টারনেট ভিত্তিক অপরাধ কর্মকাণ্ডে একটি আর্থিক মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমাদের জন্য ক্ষতিকারক না উপকারী তা হয়ত ভবিষ্যৎ ঠিক করে দেবে। তা যে আমাদের ওপরও অনেকখানি নির্ভর করবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ খনি খননের জন্য উদ্ভাবিত ডিনামাইটও কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে ব্যবহৃত হয়েছে মানুষকে মারার জন্য, যুদ্ধ জয়ের জন্য।

সুতরাং অনেক ভালো প্রযুক্তিও খারাপ হয়ে যেতে পারে যদি তা খারাপ উদ্দেশ্যে দুষ্ট লোকের দ্বারা পরিচালিত হয়। আর সেই রকম কোনো কিছু যদি ঘটে, তাহলে আমাদেরও হলিউড, বলিউডের সিনেমার মতো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার রোবটের সাথে যুদ্ধ করে টিকে থাকার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আগামীর প্রযুক্তি নির্ভর বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলেও প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জনে মনোযোগী হতে হবে। কেননা প্রকৃতঅর্থেই আগামীর বিশ্ব হবে শুধুমাত্র যোগ্যদের বেঁচে থাকার জায়গা। প্রযুক্তির ব্যবহারের উপরই এর ভালোমন্দ নির্ভর করে। তাই সৎ ও মানবিক মনোভাব নিয়েই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা AI ব্যবহার করতে হবে। তবেই আমরা সুন্দর ও বাসযোগ্য এক পৃথিবী গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

রকিবুল ইসলাম: কবি ও শিশুসাহিত্যিক

সংস্কৃতির শিক্ষা

অসিত কুমার মন্ডল

সংস্কৃতির শিক্ষা মানুষের চিত্তবিভ্রম ঘোচাতে এক অমোঘ টনিক বলা যায়। যে শিশু জন্মের পর থেকে সাংস্কৃতিক পরিবেশে বেড়ে ওঠে; তার মস্তিষ্কে কোনো কুচিন্তা, কু-ভাবনার উন্মেষ ঘটে না। সংস্কৃতি মানুষের মনকে যেমন প্রফুল্ল ও পবিত্র রাখে। তেমনি মনের উদ্যম ও গতিকে বাড়িয়ে দেয়। বড়ো হওয়ার আকাঙ্ক্ষা, মহৎ মানুষ হওয়ার দৃঢ় সংকল্প তৈরি হয় সংস্কৃতির ভেতর। সংস্কৃতি মানুষের মনকে যেমন পরিশীলিত করে, তেমনি সৃষ্টিশীল চেতনার বিকাশ ঘটায়। প্রতিভার স্ফূরণ ঘটিয়ে মনুষ্যত্বের প্রকাশ সাধনের পথকে সুদৃঢ় ও সুদূর-প্রসারিত করে।

সংগীত, নৃত্য, নাটক, আবৃত্তি, অভিনয়, চিত্রকলা ইত্যাদি বিষয়গুলো সংস্কৃতির সম্মিলিতরূপ। সুতরাং এই বিষয়গুলোর প্রতি যদি মানুষ শৈশবকাল থেকে আকৃষ্ট হয়– তাহলে মনের ভেতরে কোনো কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, মানুষের প্রতি প্রতিহিংসা, ঘৃণা, সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ মনোভাব মনের ভেতরে দানা বাঁধতে পারে না।

বর্তমান যুগে শিক্ষার কোনো শেষ নেই। আকাশ সংস্কৃতির এই যুগে বহুমুখী শিক্ষার ছড়াছড়ি চারদিকে। তবে সে শিক্ষা চরিত্র গঠন বা আলোকিত জীবন গঠনের শিক্ষা নয়। সবই অর্থমুখী শিক্ষার চরম লড়াই চলছে। কোন শিক্ষার মাধ্যমে প্রচুর অর্থ উপার্জন করা যায় এবং ধনশালী হওয়া যায়– এই চিন্তা সবার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। তবে চরিত্র গঠন, মানবিক গুণাবলি অর্জন, সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, নৈতিকতার যে শিক্ষা, সে শিক্ষা অর্জনের দিকে অধিকাংশ মানুষের কোনো উদ্যোগ নেই।

শিক্ষার সাথে সংস্কৃতির যোগ সাধিত হলে শিক্ষার ভেতরের সকল অনৈতিকতা, অপবিত্রতা, কলুষতা বিদূরিত হওয়া সম্ভব। শিক্ষাকে সংস্কৃতির সাথে বাঁধতে হবে। শিক্ষা এবং সংস্কৃতির চর্চা যখন এক ঘরে অনুষ্ঠিত হবে, তখন শিক্ষা থেকে সকল কুসংস্কার দূরীভূত হবে।

সংস্কৃতিবিহীন শিক্ষায় মানবজাতিকে কখনো অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করা যায় না। প্রচলিত শিক্ষার সাথে যদি সংস্কৃতির যোগ সাধিত না হয়– তাহলে সে শিক্ষা কখনো পরিপূর্ণ হয় না। সংস্কৃতির ভেতরে যে আলো আছে–সে আলো প্রচলিত শিক্ষায় প্রতিফলিত হয়ে প্রতিটি মানুষকে আলোকিত করে।

যে শিক্ষাই গ্রহণ করি না কেন। সকল শিক্ষার সাথে সাংস্কৃতিক শিক্ষার যোগ থাকা আবশ্যক। কারণ সংস্কৃতির শিক্ষা কোনো মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যায় না।

সংস্কৃতির শিক্ষা মানুষকে উদারতার পথে, মহত্ত্বের পথে, সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও হৃদ্যতার পথে পরিচালিত করে। মানুষে মানুষে বিভেদের দেয়াল তৈরি করে না। মানুষে মানুষে সাম্যভাব ও ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরির প্রধান মাধ্যম সংস্কৃতি। এখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র সকল মানুষের সমঅধিকার।

সংস্কৃতি উদার আকাশের মতো উন্মুক্ত। মহাসমুদ্রের মতো প্রশস্ত। সেখানে সকলের বিচরণ বাধাহীন। সংস্কৃতির মধ্যে কোনো ধর্মের ভিন্নতা নেই। ধর্ম যার যার কিন্তু সংস্কৃতি সকলের। ধর্মের নেমপ্লেট দিয়ে, ধর্মীয় চেতনা দিয়ে সাংস্কৃতিক চেতনা পরিচালিত হয় না।

সত্যিকার সাংস্কৃতিক চেতনা অহিংসার চেতনা। যে চেতনাবোধের মধ্যে সকল মানুষ সমান। কারো প্রতি কোনো হিংসা-বিদ্বেষ নেই। সাত সমুদ্র, তের নদীর জল—এক মিলনের মোহনায় মিলিত হওয়ার মতো সকল মানুষ এখানে এসে মিলতে পারে। জীবনকে বিশুদ্ধভাবে গড়ে তুলতে হলে সংস্কৃতির আলোয় নিজেকে আলোকিত করতে হবে। সংস্কৃতির আলোয় নিজেকে অবগাহন করাতে হবে। সংস্কৃতিবোধে নিজেকে পরিশীলিত করতে হবে।

একটি উন্নত, স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট হলো: দেশের সকল নাগরিক শিক্ষিত হবে এবং সংস্কৃতিমনা হবে। যেন তারা তাদের দেশের জাতীয় পতাকা এবং জাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে জাতীয় সংগীত কণ্ঠে ধারণ করতে পারে। সে জন্যে দেশের সকল নাগরিককে সাংস্কৃতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা একান্ত অপরিহার্য।

সংস্কৃতির শিক্ষা ছাড়া সুস্থ, স্থিতিশীল, প্রশান্তির সমাজ তৈরি করা কখনো সম্ভব নয়। সংস্কৃতির পথ একটি শান্ত, সুস্থ বিবেক তৈরির পথ। যেখানে মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ববোধ ও অহিংসার শিক্ষা দেয়। মানুষের ভেতরের বৈষম্য ভাবকে দূরীভূত করে।

কোনো দেশকে একবার সংস্কৃতিতে উজ্জীবিত করতে পারলে; সংস্কৃতি দেশের সকল মানুষের চেতনায় পৌঁছাতে পারলে; সে দেশ আর কখনো পিছিয়ে থাকে না। সে দেশ একটি নন্দন কাননে পরিণত হয়। একটি দেশকে সকল প্রকার কুসংস্কার থেকে মুক্ত করতে হলে; সে দেশের প্রতিটি নাগরিকের দোরগোড়ায় সংস্কৃতির আলো পৌঁছে দেওয়া অনস্বীকার্য। তাহলে সে দেশ, দেশের সমুদয় জনগোষ্ঠী অবশ্যই সংস্কৃতির আলোয় আলোকিত হবে।

যে সমাজের মানুষ তাদের সন্তানদের জীবনের শুরু থেকে সংস্কৃতির শিক্ষার ঘরে প্রবেশ করান। তাদের সন্তানেরা সত্যিকারের পবিত্র, নির্মল, আদর্শ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ হয়ে গড়ে ওঠে। সমাজের অন্ধকারের অন্ধ গলি পথে প্রবেশ করে নিজের জীবনকে বিপন্ন করে না। পিতা-মাতা হিসেবে সমাজের মানুষের কাছে তাদের সম্মান অটুট থাকে।

সংস্কৃতি নান্দনিকতার প্রতীক। সুন্দর যা কিছু সবই সংস্কৃতির মধ্যে খুঁজলে আমরা পেতে পারি। যারা সংস্কৃতির মধ্যে জীবনের স্বরূপকে খুঁজে পেয়েছেন, তারা সংস্কৃতির আলোয় আলোকিত। একটি সুন্দর জীবনের প্রত্যাশা করলে, সংস্কৃতির শিক্ষাকে ধারণ করা বাঞ্চনীয়।

অসিত কুমার মন্ডল: কবি, প্রাবন্ধিক, কথাসাহিত্যিক, শিক্ষা ও সংস্কৃতি গবেষক

সেন্টমার্টিন দ্বীপে পরিবেশবান্ধব পর্যটনের লক্ষ্যে সরকারের নতুন নির্দেশনা

সেন্টমার্টিন দ্বীপের অনন্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় ভ্রমণের ক্ষেত্রে সরকার নতুন নির্দেশনা জারি করেছে। ২২শে অক্টোবর পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের পরিবেশ-২ শাখা হতে ১২টি নির্দেশনা সংবলিত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন)-এর ধারা ১৩ অনুযায়ী প্রণীত 'সেন্টমার্টিন দ্বীপের পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং পরিবেশবান্ধব পর্যটন নির্দেশিকা, ২০২৩' (এস.আর.ও নং-১৬৫-আইন/২০২৩, তারিখ: ২৩শে মে ২০২৩)-এর আলোকে এই নির্দেশনাসমূহ কার্যকর করা হয়।

প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়া সেন্টমার্টিন দ্বীপে কোনো নৌযান চলাচলের অনুমতি দিতে পারবে না। পর্যটকদের অবশ্যই বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের স্বীকৃত ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে অনলাইনে টিকিট ক্রয় করতে হবে, যেখানে প্রতিটি টিকিটে Travel Pass এবং QR Code সংযুক্ত থাকবে। QR Code ছাড়া টিকিট নকল হিসেবে গণ্য হবে।

দ্বীপে ভ্রমণের সময়সূচি এবং পর্যটক উপস্থিতিও এবার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত থাকবে। নভেম্বর মাসে পর্যটকরা শুধু দিনের বেলায় ভ্রমণ করতে পারবেন, রাত্রিযাপন করা যাবে না। ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে রাত্রিযাপনের অনুমতি থাকবে। ফেব্রুয়ারি মাসে দ্বীপে পর্যটক যাতায়াত সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকবে। প্রতিদিন গড়ে দুই হাজারের বেশি পর্যটক দ্বীপে ভ্রমণ করতে পারবেন না।

সেন্টমার্টিনের প্রাকৃতিক পরিবেশ অক্ষুণ্ন রাখতে দ্বীপে রাতে সৈকতে আলো জ্বালানো, শব্দ সৃষ্টি বা বারবিকিউ পার্টি করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেয়া বনে প্রবেশ, কেয়া ফল সংগ্রহ বা ক্রয়-বিক্রয়, সামুদ্রিক কাছিম, পাখি, প্রবাল, রাজকাঁকড়া, শামুক-ঝিনুক ও অন্যান্য জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এছাড়া সৈকতে মোটরসাইকেল, সী-বাইকসহ যে-কোনো মোটরচালিত যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে।

নিষিদ্ধ পলিথিন বহন করা যাবে না এবং একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিক যেমন চিপসের প্যাকেট, প্লাস্টিক চামচ, স্ট্র, সাবান ও শ্যাম্পুর মিনিপ্যাক, ৫০০ ও ১০০০ মিলিলিটারের প্লাস্টিক বোতল ইত্যাদি বহন নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। পর্যটকদের নিজস্ব পানির ফ্লাস্ক সঙ্গে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবেদন: আয়েশা রহমান

চাই একটি মানবিক বাংলাদেশ

মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন

মানবিকতা একটি জাতির সভ্যতার মাপকাঠি। শুধু প্রযুক্তি, অবকাঠামো বা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিই একটি দেশকে উন্নত করে না। বরং মানুষের মধ্যে যদি পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, সহানুভূতি না থাকে, তাহলে সেই উন্নয়ন অনেকাংশই অর্থহীন। একটি মানবিক সমাজ গড়ে তুলতে হলে আগে মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখতে-শিখতে হবে। উন্নয়ন তখনই টেকসই হয়, যখন তার ভেতর মানবিকতা থাকে। তাই 'মানবিক বাংলাদেশ' গঠন আজ সময়ের দাবি। মানবিকতা মানে শুধু দয়া-সহানুভূতি নয়; এটি হলো মানুষে মানুষে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, সহনশীলতা ও সহযোগিতার মনোভাব। ধর্ম, বর্ণ, ভাষা বা রাজনৈতিক মতভেদ ভুলে সবাইকে মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করাই মানবিকতার প্রকৃত রূপ।

সব ধর্মেই মানবিকতার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ইসলাম বলে, 'যে ব্যক্তি একজন মানুষকে বাঁচায়, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে বাঁচালো।' অন্যান্য ধর্মও মানুষে মানুষে ভালোবাসা ও শান্তির বার্তা দেয়। তাই মানবিক বাংলাদেশ মানে ধর্মীয় মূল্যবোধের বাস্তব প্রয়োগ। তবে শুধু গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক উন্নয়নই যথেষ্ট নয়, আমাদের প্রয়োজন একটি মানবিক বাংলাদেশ যেখানে মানুষে মানুষে ভালোবাসা, সহানুভূতি, সহমর্মিতা এবং মানবিক মূল্যবোধ থাকবে। বাংলাদেশকে একটি মানবিক রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চাই। যে দেশে মানুষ মানুষকে সম্মান করবে, মানুষের সকল অধিকার নিশ্চিত হবে। যে দেশে কোনো যুবক বেকার থাকবে না। সকলের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে। মিথ্যা-শঠতা থাকবে না; থাকবে না অন্যকে অসম্মানিত না করা। নারী সে শিক্ষার্থী হোক বা কর্মজীবী হোক সর্বক্ষেত্রে সে যেন নিরাপদ অনুভব করে: সেই স্বপ্নের দেশ চাই। এর জন্য প্রয়োজন দেশের সকল জনগণের সচেতনতা, সহযোগিতা ও সমর্থন।

আমরা চাই মানবিক বাংলাদেশ। মানবিক বাংলাদেশ হবে এমন এক দেশ, যেখানে প্রতিটি মানুষ অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে; গরিব-ধনী, নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ সবাই সমান সম্মান সমহিমায় পাবে; শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা সকলের জন্য নিশ্চিত হবে; পথশিশু, অসহায় ও প্রতিবন্ধীরা সুযোগ পাবে স্বাভাবিক জীবনের; সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও সামাজিক দায়িবোধ থাকবে প্রতিটি নাগরিকের মাঝে; ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকলে মিলেমিশে বসবাস করবে।

একটি মানবিক বাংলাদেশ গড়তে হলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। শিক্ষাকে রাজনৈতিক দৃষ্টি থেকে দেখা যাবে না। আমাদের সমাজে যে নৈতিক অবক্ষয়, আত্মকেন্দ্রিকতা ও সহানুভূতির অভাব দেখা দিচ্ছে, তা রোধ করতে হলে সামাজিক মূল্যবোধকে আবার কেন্দ্রে ফিরিয়ে আনতে হবে। শিশুদের ছোটোবেলা থেকেই সত্যবাদিতা, শ্রদ্ধা, সহানুভূতি, দায়িত্ববোধ, ও মানবিকতা শেখাতে হবে। বাবা-মা ও অভিভাবকদের নিজেদের আচরণেও মূল্যবোধের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। গণমাধ্যমকে মানবিকতা বৃদ্ধির জন্য ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে হবে। সর্বোপরি, আমাদের প্রত্যেককে নিজের দায়িত্বে মানবিক আচরণ করতে হবে।

শুধু উন্নয়ন নয়, আমরা চাই একটি মানবিক বাংলাদেশ— যেখানে মানুষের মধ্যে থাকবে ভালোবাসা, সহানুভূতি ও সম্মানবোধ। এই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হলে রাষ্ট্র, সমাজ এবং ব্যক্তিপর্যায়ে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। মনে রাখতে হবে, মানবিক বাংলাদেশ গড়তে হলে আমাদের প্রত্যেককে আগে মানুষ হতে হবে। আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে যে প্রতিশ্রুতি জনগণকে দেওয়া হয়েছিল, সেখানেই জনগণের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি ছিল। পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছিল বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশকে একটি সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র ঘোষণা করছি। অল্প কথায় কী অপূর্ব সুন্দর এবং তাৎপর্যপূর্ণ এক ঘোষণা!

রাষ্ট্র যেসব সুবিধা তার নাগরিকদের দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তা সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হবে, এই হলো সাম্যের সহজ মানে। অর্থাৎ আপনার আর আমার সামাজিক অবস্থান ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি-পেশা আলাদা হতেই পারে, কিন্তু রাষ্ট্র আমাদের আলাদা চোখে দেখবে না, বরং রাষ্ট্রের সুবিধাদি পাওয়ার অধিকার আমাদের সমান থাকবে। সামাজিক ন্যায়বিচার মানে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারসমূহের সমবণ্টন। আর মানবিক মর্যাদা মানে মানুষ হিসেবে আপনার-আমার সম্পূর্ণ মর্যাদা পাওয়ার অধিকার। মুক্তিযুদ্ধের পর জনগণ বার বার আন্দোলন-সংগ্রামের ভেতর দিয়ে তাদের অধিকার ফিরে পেতে চেয়েছে। নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থান আর চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থান জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে দুটো মাইলফলক হয়ে থাকবে।

মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন: সিনিয়র তথ্য অফিসার, জনসংযোগ কর্মকর্তা ভূমি মন্ত্রণালয় [সৌজন্যে: পিআইডি ফিচার]

আধুনিক নারী প্রগতি আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব সুফিয়া কামাল

তারিকুল আমিন

ডাকটিকিটের ইংরেজি শব্দ হচ্ছে postage stamps। ইতিহাস আজীবন কথা বলে। কথা বলে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে যা পরে ইতিহাস হয়ে উঠে একটা সময়। ইতিহাস মানুষকে ভাবায়, তাড়িত করে। প্রতিদিনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা কালক্রমে রূপ নেয় ইতিহাসে। সেই ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে রয়ে যায় ডাকটিকিট। ডাকটিকিট একটি দেশের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সভ্যতা ধারণ করে এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের পরিচয় করিয়ে দেয়। আর সেই ডাকটিকিট ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতা, ভিন্ন দেশের সংস্কৃতি এবং সেই দেশের বিখ্যাত ব্যক্তির কর্ম তুলে ধরা হয় উক্ত ছোট্ট সেই ডাকটিকিটে। যদি প্রথম ডাকটিকিটে রানির ছবি দেওয়া না থাকত তাহলে আমরা অনেকেই বুঝতে পারতাম না যে এটা কোন দেশের ডাকটিকিট। বেগম সুফিয়া কামাল (২০শে জুন ১৯১১-২০শে নভেম্বর ১৯৯৯) বাংলাদেশের একজন প্রথিতযশা কবি, লেখিকা, নারীবাদী এবং আধুনিক নারী প্রগতি আন্দোলনের একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব। এই মহান লেখিকাকে নিয়ে বাংলাদেশ সরকার প্রকাশ করেন একখণ্ড ডাকটিকিট। যেখানে তার সরল চোখের আড়ালে রয়েছে নারীদের প্রতি অন্যায়ের বলিষ্ঠ কলমের রেখা। তার সেই চাহনিতে ছিল না কোনো ভয়, ছিল না মাথা নত করার মতো ভাবনা।

সুফিয়া কামালকে 'জননী সাহসিকা' বলা হয়, তার কারণও ছিল অনেক। তিনি ছিলেন একজন সাহসী নারী এবং একজন সমাজ সংস্কারক। এছাড়াও তিনি 'প্রথিতযশা কবি, লেখিকা, নারীবাদী নেত্রী'। তাকে 'গীতিকবি' হিসেবেও উল্লেখ করা হয়। কারণ তিনি রবীন্দ্র কাব্যধারার গীতি কবিতার রচয়িতা ছিলেন। আধুনিক বাংলাদেশের নারী প্রগতি আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব বেগম সুফিয়া কামালকে নিয়ে ডাকটিকিট।

postage stamps বা ডাকটিকিট শুধু একখণ্ড কাগজ যা ডাক মাশুল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ডাকটিকিট বিভিন্ন কালারের বা বিভিন্ন আয়তনের হয়ে থাকে। এই ডাকটিকিটগুলোতে নানা বর্ণে সজ্জিত হয়ে ফুটে উঠে একটি দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, বরেণ্য ব্যক্তিত্ব প্রকৃতি দিকগুলো। এতে করে সেই দেশকে খুব সহজে চিনতে পারা যায়। প্রতিবছর প্রচুর পরিমাণে ডাক বিভাগ থেকে ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়। সাধারণত অধিকাংশ দেশে ডাকটিকিটগুলো চারকোনা বা বক্স আকৃতির হয়ে থাকে। নানা দেশে নানা আকৃতির ডাকটিকিট তৈরি হয়। যথা– ত্রিকোনাকার, গোলাকার ও স্টার আকৃতিরসহ বিভিন্ন আকৃতির। এই ডাকটিকিটগুলো সাধারণত কাগজের তৈরি হয়ে থাকে। তবে কাঠের ফাইবার, সিনথেটিক কাপড়ের তৈরি করা

ডাকটিকিট ও পাওয়া যায়। নানা প্রকার ডাকটিকিট প্রচলিত আছে। ডাকটিকিট প্রধানত তিন প্রকার। যথা–স্মারক, নির্দিষ্ট/প্রচলিত, সরকারি। ১। স্মারক ডাকটিকিট আবার তিন প্রকার। যেমন: ব্যক্তিগত, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক। ২। নির্দিষ্ট/প্রচলিত ডাকটিকিট ও তিন প্রকার। যেমন: ব্যক্তিগত, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক। ফিলাটেলি শাখায় ফাস্ট ডে কভার ও পাওয়া যায়। ডাকটিকিটের প্রধান অংশ ৪টি। যথা– ছবি, টিকিটের ছিদ্র, নাম, দেশের নাম।

ডাকটিকিটের জনক যুক্তরাজ্যের রোল্যান্ড হিল। ১৮৩৭ সালের কথা, সে সময় নাকি ডাকটিকিট চালুর আগে প্রাপককেই ডাক মাশুল দিতে হতো। চিঠির পাতার ওপর ভিত্তি করে ডাকমাশুল নির্ধারিত হতো। প্রায় সময় এই ডাকমাশুল ছলাকলায় প্রাপকরা দিতে চাইতেন না। সে সময় অসুবিধাসমূহ দূর করার জন্য রোল্যান্ড হিল ডাক বিভাগের সংস্কারের প্রস্তাব দেন। এর অন্যতম প্রধান কারণ ছিল ডাকটিকিটের প্রচলন করা।

১৮৪০ সালে তার এই প্রস্তাব অনুসারেই প্রাপকের পরিবর্তে প্রেরক কর্তৃক ডাকমাশুল দেবার রীতি প্রবর্তন হয়। সেই সময় থেকেই ওজনের ভিত্তিতে ডাক মাশুল দেবার পদ্ধতি ও চালু হয়। ১৮৪০ সালে যুক্তরাজ্যে পৃথিবীর প্রথম ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়। এই ডাকটিকিটে ব্রিটেনের রানির প্রতিকৃতি ছিল। রানি ভিক্টোরিয়ার ছবি সংবলিত এই ডাকটিকিটটি চালু ১৮৪০ সালের

১লা মে। রোল্যান্ড হিল এটি ডিজাইন করেন। তিনি ব্রিটিশ ডাক ব্যবস্থার উন্নতির জন্য অনেক অবদান রাখেন। তাকে বলা হয় 'ফাদার অব পোস্টেজ স্ট্যাম্প'। উইলিয়াম হুয়োনের আঁকা রানি ভিক্টোরিয়ার ছবি দেখা যায় পেনি ব্ল্যাকে। এটি ছিল কালো রঙের। কালো রঙের কারণে নাম হয় ব্ল্যাক। এর মূল্য ছিল ১ পেনি। ব্ল্যাক রঙে ১ পেনি মূল্যের কারণে বিশ্বেও প্রথম ডাকটিকিটের নাম হয় 'পেনি ব্ল্যাক'। আর বেগম সুফিয়া কামাল-এর সাদা এই ছোটো ডাকটিকিটকে বলতে পারি 'পেনি হোয়াইট'।

হে কবি! নীরব কেন-ফাল্গুন যে এসেছে ধরায়,
বসন্তে বরিয়া তুমি লবে না কি তব বন্দনায়?
কহিল সে স্নিগ্ধ আঁখি তুলি-
দখিন দুয়ার গেছে খুলি?
বাতাবী নেবুর ফুল ফুটেছে কি? ফুটেছে কি আমের মুকুল?
দখিনা সমীর তার গন্ধে গন্ধে হয়েছে কি অধীর আকুল?

ডাকটিকিট সংগ্রাহক সাজিদ রহমান বলেন, "ডাকটিকিট শুধু এক টুকরো রঙিন কাগজ নয়, এটি একটি দেশের ইতিহাস। আমাদের দেশে ভুল ধারণা আছে, ডাকটিকিট কেবল 'শিশুদের হবি'। কিন্তু একেকটি ডাকটিকিটের একেকটি গল্প আছে। সেগুলো সংরক্ষণের দায় আছে।" কিন্তু সরকারিভাবে এটি হয় না কেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে হয় না। এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব সরকার যেভাবে দেখবে সেভাবেই মূল্যায়িত হবে। দেখবেন, সংরক্ষণের যে পদ্ধতি সেটি একেবারেই সঠিক নয়। তারা জানেও না কি সম্পদ নষ্ট করে ফেলছে।'

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যতজন শব্দ সম্রাজ্ঞী আছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন বেগম সুফিয়া কামাল। যার প্রতিটা শব্দের গাঁথুনি দিয়ে পাঠক হৃদয়ে কবিতার মায়ায় বেঁধেছেন ১৯৩৮ সালে তার *সাঁঝের মায়া* কাব্যগ্রন্থ দিয়ে। এরপর তিনি এই পৃথিবীকে দেখেছেন নতুন কবিতার আলোকে অন্য এক জগৎ। ১৯৬৪ সালে *উদাত্ত পৃথিবী* কাব্যগ্রন্থ দিয়ে পৃথিবীকে দেখেছেন ভিন্ন মাত্রায়। তিনি মুক্তবুদ্ধি ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন এবং সমাজের অগ্রগতিতে অবদান রেখেছেন। এছাড়াও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ছিলেন এবং নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেছেন। তিনি রাজনৈতিক সক্রিয়তার মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন এবং আইয়ুব খানের মতো শাসকের বিরুদ্ধে সাহসের সাথে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন।

সৈয়দা সুফিয়া বেগম ২০শে জুন ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দের তৎকালীন পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের বাকেরগঞ্জ জেলার শায়েস্তাবাদে মামার বাড়ি রাহাত মঞ্জিলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একটি সম্ভ্রান্ত বাঙালি মুসলমান জমিদার পরিবারের মেয়ে ছিলেন যারা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অন্তর্গত শিলাউরের সৈয়দ বংশ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর বয়স যখন সাত বছর, তখন তার বাবা সৈয়দ আব্দুল বারী ওকালতি চাকরি এবং ঘরবাড়ি ছেড়ে সন্ন্যাসী-সুফি হয়ে যান। তাই বেগম সুফিয়া কামাল তার মা সৈয়দা সাবেরা বেগমের সাথে মামার বাড়িতেই বড়ো হন। তাঁর নানা খান বাহাদুর নবাব সৈয়দ মীর মোয়াজ্জেম হোসেন ছিলেন একজন জমিদার এবং বিখ্যাত ম্যাজিস্ট্রেট।

সাহিত্যপাঠের পাশাপাশি সুফিয়া কামাল সাহিত্য রচনা শুরু করেন। ১৯২৬ সালে তার প্রথম কবিতা 'বাসন্তী' সেসময়ের প্রভাবশালী সাময়িকী *সওগাতে* প্রকাশিত হয়। ত্রিশের দশকে কলকাতায় অবস্থানকালে বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র যেমন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শরৎচন্দ্র প্রমুখের দেখা পান। মুসলিম নারীদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার জন্য বেগম রোকেয়ার প্রতিষ্ঠিত সংগঠন 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলামে' রোকেয়ার সঙ্গে সুফিয়া কামালের পরিচয় হয়। বেগম রোকেয়ার চিন্তাধারা ও প্রতিজ্ঞা তার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়, যা তার জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে।

সুফিয়া কামাল ১৯৯৯ সালের ২০শে নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয়। বাংলাদেশি নারীদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই সম্মান লাভ করেন। প্রতিবছর এই দিনটিতে তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্মরণ করা হয়। বেগম সুফিয়া কামালের উপর বাংলাদেশে ডাকটিকিট প্রকাশ করা হয়েছে, যা তাঁর সম্মানার্থে সরকারিভাবে প্রকাশিত হয়। এই ডাকটিকিটের মাধ্যমে এই প্রথিতযশা কবি, সাহিত্যিক এবং নারী অধিকার আন্দোলনের পথিকৃতকে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। ডাকটিকিটটির মূল বিষয় ছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল। তাঁর সাহিত্যিক ও সামাজিক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এবং সম্মান প্রদর্শনের জন্য এই ডাকটিকিটটি প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশ ডাক বিভাগ এই ডাকটিকিট প্রকাশ করেন। ডাকটিকিট শুধু যোগাযোগের একটি মাধ্যম নয়, বরং এটি বাংলাদেশের একজন গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ব্যক্তিত্বের প্রতি দেশের সম্মান।

তারিকুল আমিন: প্রাবন্ধিক, গল্পকার, অভিনয় ও আবৃত্তি শিল্পী

গ্রন্থাগার: জ্ঞানের ভাণ্ডার

শাহানা আফরোজ

মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিক জীব। বুদ্ধি ও মননের অনুশীলনের প্রয়োজনে মানুষ জ্ঞান আহরণ করে। মনীষীদের মতে জ্ঞান অর্জনের দুটো উপায়। একটি দেশভ্রমণ, আরেকটি বই পড়া। দেশভ্রমণ ব্যয় ও সময় সাপেক্ষ তাই সবার জন্য সম্ভব নয়। সে তুলনায় জ্ঞান আহরণের জন্য বই পড়া-ই হলো উত্তম উপায়। কিন্তু জ্ঞানভাণ্ডারের বিচিত্র সমারোহে মানুষের পক্ষে একত্রে সব বই সংগ্রহ করা ও পড়া সম্ভব হয় না। তবে এই অসাধ্য সাধন কিছুটা হলেও সম্ভব হয় গ্রন্থাগারের মাধ্যমে। জ্ঞানের আধার হলো বই, আর বইয়ের আবাসস্থল হলো গ্রন্থাগার বা লাইব্রেরি। মানুষের হাজার বছরের লিখিত-অলিখিত সব ইতিহাস ঘুমিয়ে আছে একেকটি গ্রন্থাগারের ভাঁজে ভাঁজে। যেখান থেকে মানুষ সময়ের পাতায় ভ্রমণ করে। একটি গ্রন্থাগার মানব জীবনকে যেমন পাল্টে দেয় তেমনি আত্মার খোরাকও জোগায়। তাই গ্রন্থাগারকে বলা হয় শ্রেষ্ঠ আত্মীয় যার সাথে সবসময় ভালো সম্পর্ক থাকে। গ্রন্থাগার শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ করলে 'গ্রন্থ+ আগার' পাওয়া যায়। অর্থাৎ গ্রন্থাগার হলো গ্রন্থ সজ্জিত পাঠ করার আগার বা স্থান। জ্ঞানের এমন এক সমুদ্র সেখানে বিচরণ করে প্রতিটি মানুষ উন্নত মননের অধিকারী হতে পারে। আর তাই গ্রন্থাগারকে তুলনা করা হয় শব্দহীন মহাসমুদ্রের সাথে। এটি অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের মাঝে সেতুবন্ধনের এক নীরব সাক্ষী।

প্রাচীনকাল থেকেই পুঁথি সংরক্ষণের প্রথা ছিল। এসব পুঁথি লেখা হতো তালপাতায়, গাছের বাকলে, পশুর চামড়ায়, আবার কখনো পাথরে ও টেরাকোটা পদ্ধতিতে। সাধারণত এই পুঁথিগুলো সংরক্ষণ করা হতো বিভিন্ন ধর্মগৃহে বা বিহারে অথবা উপাসনালয়ে। তবে বিশ্বের প্রথম গ্রন্থাগার ধারণা শুরু করা হয়েছিল প্রাচীন মিসরে। তখন উপাসনার পাশাপাশি তাত্ত্বিক আলোচনা বা জ্ঞান প্রসারের জন্য পুরোহিতদের নিজেদের প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস বা তথ্য সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তারই জের ধরে মিসরের এক মন্দিরে শুরু এই গ্রন্থাগার। সভ্যতার ক্রমশ অগ্রসর হওয়ার পথে মানুষ তার সৃষ্টিশৈলীকে সংরক্ষণ করা শুরু করল। মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া, ইরাকের বাগদাদ, দামেস্ক, প্রাচীন গ্রিস ও রোমে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের নিদর্শন পাওয়া যায়। এছাড়া উপমহাদেশের তক্ষশীলা ও নালন্দায় সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল। বাংলাদেশের প্রথম গ্রন্থাগার রামমোহন

রায় লাইব্রেরি। ১৮৬৯ সালে ব্রাহ্ম মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়ই ব্রাহ্ম সমাজের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক অভয় চন্দ্র দাশ মন্দির ভবনে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন।

গ্রন্থাগারের বিশাল সংগ্রহশালায় নিজের রুচি ও মনের চাহিদা অনুযায়ী বই পাওয়া যায়। এই কারণে জ্ঞানার্জনের জন্য গ্রন্থাগার অত্যন্ত প্রয়োজন। গ্রন্থাগারের নানা রকমফের হয়। বাংলাদেশের গ্রন্থাগার বা লাইব্রেরিগুলোকে সাধারণত তাদের উদ্দেশ্য এবং ব্যবহারকারীর ধরন অনুযায়ী কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়–

জাতীয় গ্রন্থাগার (National Library): এটি রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি। বাংলাদেশে আগারগাঁওয়ে অবস্থিত আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর এই দায়িত্ব পালন করে। দেশে প্রকাশিত সব বইয়ের অন্তত একটি কপি এখানে সংরক্ষিত থাকে।

গণগ্রন্থাগার (Public Library): সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার বাংলাদেশের প্রধান পাবলিক লাইব্রেরি। সাধারণ জনসাধারণের শিক্ষার প্রসার ও অবসর বিনোদনের জন্য তৈরি। ঢাকার শাহবাগে অবস্থিত। এছাড়া জেলা ও উপজেলা পর্যায়েও সরকারি গণগ্রন্থাগার রয়েছে।

শিক্ষামূলক বা একাডেমিক গ্রন্থাগার (Academic Library): কোনো নির্দিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র ও শিক্ষকদের ব্যবহারের জন্য এই লাইব্রেরিগুলো গড়ে তোলা হয়। যেমন: স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার।

বিশেষায়িত গ্রন্থাগার (Special Library): কোনো বিশেষ বিষয় বা পেশার ওপর ভিত্তি করে এই লাইব্রেরিগুলো তৈরি হয়। যেমন- বিএআরআই (BARI) লাইব্রেরি (কৃষি বিষয়ক), আইসিডিডিআর, বি (icddr,b) লাইব্রেরি (চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক), সংসদ সচিবালয় গ্রন্থাগার।

বেসরকারি বা ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার (Private/Non-government Library): ব্যক্তি উদ্যোগে বা কোনো এনজিওর মাধ্যমে পরিচালিত লাইব্রেরি। যেমন: বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র বা বিভিন্ন এলাকায় গড়ে ওঠা পাঠাগার।

ভ্রাম্যমান লাইব্রেরি: প্রায় এক লাখের মতো বই সংগ্রহে রয়েছে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র লাইব্রেরিতে। এছাড়া তাদের ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি রয়েছে। ঢাকার বিভিন্ন পয়েন্ট ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে হাজির হয় এই লাইব্রেরি। বাংলাদেশে এই কাজটি প্রথম চালু করে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র।

এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরি: এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরি দুর্লভ বইয়ের সংগ্রহশালা হিসেবেই বেশি পরিচিত। ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত এই গ্রন্থাগারে প্রায় ১৫ হাজারের অধিক বই রয়েছে। কেবল সদস্যরাই লাইব্রেরিটি ব্যবহার করতে পারেন। যদিও অনুমতি সাপেক্ষে অন্যরাও এ লাইব্রেরি ব্যবহারের সুবিধা পেতে পারেন। গবেষকরা খুব সহজেই এ অনুমতি পেয়ে থাকেন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি: এক লাখ ৩০ হাজারের মতো বই এ লাইব্রেরির সংগ্রহে আছে। এর অধিকাংশই ইসলামি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক। ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, দর্শন, স্বাস্থ্যবিষয়ক বইও আছে এখানে।

বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ লাইব্রেরি: সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ক দেশের সবচেয়ে বড়ো লাইব্রেরি। এক লাখ ৩০ হাজারের মতো বই ও জার্নাল আছে এখানে। নির্দিষ্ট কিছু

লাইব্রেরির সঙ্গে এ লাইব্রেরির বই ও তথ্য আদান-প্রদান চুক্তি আছে। এ কারণে পাঠকরা প্রায়ই নতুন বই পেয়ে থাকেন।

ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অবস্থিত এই লাইব্রেরিটি ইংরেজি ভাষায় লিখিত আন্তর্জাতিক মানের একাডেমিক ও নন-একাডেমিক প্রায় ২৫ হাজার বইয়ের বিশাল এক সংগ্রহশালা। শুধু তা-ই নয়, ১৫ হাজারের বেশি সিডি-ডিভিডির সংগ্রহের পাশাপাশি ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য একটি সাইবার জোনও আছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার: সংগ্রহের দিক থেকে দেশের সবচেয়ে বড়ো লাইব্রেরি এটি। ছয় লাখ ১৬ হাজার ৮৬৫টি বই ও সাময়িকী আছে গ্রন্থাগারটিতে। ৩০ হাজারেরও বেশি বিরল পাণ্ডুলিপি ও মাইক্রোফিল্মও লাইব্রেরির সংগ্রহে আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাই কেবল লাইব্রেরিটি ব্যবহার করতে পারে।

নজরুল ইনস্টিটিউট: ১৯৮৫ সালের ১২ই জুন ধানমন্ডির কবি ভবনে গ্রন্থাগারটি স্থাপিত হয়। কাজী নজরুল ইসলামের সবকিছু একত্রে পেতে এ গ্রন্থাগারের তুলনা নেই।

বাংলা একাডেমি লাইব্রেরি: এক লাখ ২০ হাজার বই ও ৭০ হাজার পত্রপত্রিকার এক বিশাল সংগ্রহশালা এ গ্রন্থাগারটি। এদের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গ্রন্থাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণে এ গ্রন্থাগার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এছাড়াও চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কিত গ্রন্থাগারসমূহ হচ্ছে ন্যাশনাল হেলথ লাইব্রেরি অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন সেন্টার, বারডেম গ্রন্থাগার, বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ, দি ইনস্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ, দি ইনস্টিটিউট অব চেস্ট রিসার্চ, দি ইনস্টিটিউট অব কমিউনিকেবল ডিজিজেজ, দি ইনস্টিটিউট অব হার্ট রিসার্চ অ্যান্ড কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজেজ এবং অন্যান্য কিছু সংশ্লিষ্ট সংগঠন ও হাসপাতালের গ্রন্থাগার।

গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারগুলো হলো বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, পরিসংখ্যান গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিকল্পনা কমিশন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলা একাডেমি, শিশু একাডেমি, বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী একাডেমি, টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, লেদার টেকনোলজি ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প ইনস্টিটিউটের মতো প্রতিষ্ঠানেরও গ্রন্থাগার রয়েছে।

এছাড়া প্রায় সকল সরকারি মন্ত্রণালয়, দপ্তর এবং অধিদপ্তরের নিজস্ব গ্রন্থাগার রয়েছে। স্বায়ত্তশাসিত ও আধাস্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহও তাদের নির্দিষ্ট প্রয়োজন মেটাতে গ্রন্থাগার গড়ে তুলেছে। সরকারি গ্রন্থাগারসমূহের মধ্যে সর্ববৃহৎ হচ্ছে বাংলাদেশ সচিবালয় লাইব্রেরি। বর্তমানে প্রায় প্রতিটি জেলা এবং উপজেলায় বেসরকারি গণগ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে।

গ্রন্থাগার জ্ঞান-বিজ্ঞানকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার এক অনন্য মাধ্যম হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার শুধু অপরিহার্য নয় বরং প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধির একটি পরিমাপক হচ্ছে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার।

শাহানা আফরোজ: সিনিয়র সাবএডিটর, নবারুণ, ডিএফপি

'ই-বেইলবন্ড' চালুর মাধ্যমে বিচার প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও গতি আসবে

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বলেন, 'ই-বেইলবন্ড' চালুর মাধ্যমে এক ক্লিকে বারো ধাপের অবসান হবে। তিনি বলেন, নারায়ণগঞ্জকে মুক্তির প্রতীক হিসেবে দেখতে এখানে 'ই-বেইলবন্ড' প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ফলে বিচার প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং নাগরিক সেবায় গতি আসবে। এটি নতুন বাংলাদেশ নির্মাণের লক্ষ্য পূরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এ উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের বিচার ব্যবস্থায় ডিজিটাল রূপান্তরের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সূচিত হলো।' ১৫ই অক্টোবর নারায়ণগঞ্জ সার্কিট হাউস প্রাঙ্গণে নারায়ণগঞ্জে 'ই-বেইলবন্ড'-এর পাইলটিংয়ের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপদেষ্টা এসব কথা বলেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বলেন, প্রযুক্তির মাধ্যমে আইনি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। 'ই-বেইলবন্ড' সেই ধারাবাহিক প্রচেষ্টারই অংশ। এ অনন্য উদ্যোগের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টাসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে তিনি ধন্যবাদ জানান। কোনো ভেন্ডর ডিপেন্ডেন্ট না হয়ে আইসিটি বিভাগের কর্মকর্তারা এ সফ্টওয়্যার তৈরি করেছেন যা অসামান্য সফলতা বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে এটর্নি জেনারেল মোঃ আসাদুজ্জামানসহ আইন মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ, আইনজীবী ও বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, 'ই-বেইলবন্ডের' মাধ্যমে এখন থেকে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জামিন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে অনলাইনে সম্পন্ন হবে, যা বিচার প্রক্রিয়াকে আরো সহজ, দ্রুত ও নিরাপদ করবে।

প্রতিবেদন: রাসেল হোসেন

জীবনঘনিষ্ঠ সামাজিক সিনেমার জনপ্রিয় নির্মাতা কাজী জহির

আপন চৌধুরী

চলচ্চিত্র একটি প্রযুক্তিনির্ভর শিল্প, বাণিজ্য ও শক্তিশালী গণমাধ্যম। সপ্তকলার সমন্বয়ে এ মাধ্যমটি গড়ে উঠলেও এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মাধ্যম। একমাত্র চলচ্চিত্রের মাধ্যমেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষের ভাষা সংস্কৃতি থেকে শুরু করে জীবনযাপনের বাস্তব চিত্র জানা যায়। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র প্রদর্শন শুরু হয়েছে ১৮৯৮ সালে ১৭ই এপ্রিল বাংলা চলচ্চিত্রের জনক মানিকগঞ্জের হীরালাল সেনের ভোলায় চলচ্চিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে। তারপর ধাপে ধাপে ঢাকা তথা বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে নতুন দিগন্তের সৃষ্টি হয়েছে। বিএফডিসি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই আব্দুল জব্বার খানের একক প্রচেষ্টায় পূর্ণদৈর্ঘ্য সবাক চলচ্চিত্র *মুখ ও মুখোশ* (১৯৫৬) মুক্তি পায়। এরপর ১৯৫৭ সালের ৩রা এপ্রিল বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি) প্রতিষ্ঠা করলে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে সোনালি দিনের সূচনা হয়।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস পাঠে দেখা যায়, আমাদের আছে হাজার বছরের বাঙালি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতিকে ধারণ করে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন ঘনিষ্ঠ চলচ্চিত্র নির্মাণে অনেক চলচ্চিত্র নির্মাতা অবদান রেখেছেন। কাজী জহির অন্যতম জনপ্রিয় চলচ্চিত্র নির্মাতা ও প্রযোজক। কাজী জহির রুচিশীল দর্শকের জন্য জীবন ঘনিষ্ঠ চলচ্চিত্র নির্মাণ করে দর্শকের মনে জায়গা করে নিয়েছেন। তাঁর *ময়নামতি*, *অবুঝ মন*, *বধূ বিদায়*, *ফুলের মালা* প্রভৃতি ছবিগুলোতে গ্রামবাংলার সমাজ বাস্তবতার চিত্র ফুটে উঠে। কাজী জহির বিশিষ্ট নির্মাতা জহির রায়হানের প্রথম পরিচালিত চলচ্চিত্র *কখনো আসেনি* (১৯৬১) প্রযোজনা করে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হলে নিজেই চলচ্চিত্র পরিচালনায় আসেন। কাজী জহির তখন নটরডেম কলেজের অধ্যাপক। তাঁর পরিচালিত প্রথম চলচ্চিত্র *বন্ধন* (১৯৬৪)। এরপর একে একে আরো সাতটি চলচ্চিত্র পরিচালনা করেন। প্রযোজনা করেন আরো আঠারোটি চলচ্চিত্র। তাঁর শেষ পরিচালিত ছবি *ফুলের মালা* (১৯৮৭)। তাঁর পরিচালিত সবগুলো ছবিই ছিল দর্শক নন্দিত ও সুপারহিট। তিনি চলচ্চিত্রের কাহিনির মাধ্যমে দর্শকের মনে জায়গা করে নিয়েছেন। তাঁর ছবির গানগুলোও ছিল দারুণ জনপ্রিয়। তাঁর সবগুলো সিনেমার নায়ক-নায়িকা ছিল তখনকার সময়ের জনপ্রিয় শিল্পী। তিনি প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান চিত্রা ফিল্মস থেকে সবগুলো চলচ্চিত্র প্রযোজনা ও পরিচালনা করেন। এর বাইরেও তিনি অন্য পরিচালকদের দিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। কাজী জহিরের মৃত্যুর পর চিত্রা ফিল্মস থেকে নির্মিত হয় কাজী হায়াৎ পরিচালিত *মিনিষ্টার* (২০০৩) ও *আমার স্বপ্ন* (২০১০)। চিত্রা ফিল্মস থেকে সর্বশেষ প্রযোজিত ছবি জাকির হোসেন রাজু পরিচালিত অনেক সাধের ময়না (২০১৪)।

কাজী জহির ১৯৮২ সালে নাগর মহল সিনেমা হল সরকারের কাছ থেকে লিজ নিয়ে চিত্রামহল সিনেমা হল চালু করেন ঢাকার তাঁতী বাজার মোড়ে। কাজী জহির ৮টি চলচ্চিত্র পরিচালনা করেন ও তাঁর চিত্রা ফিল্মস থেকে ১৮টি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়।

'কীসের যেন আওয়াজ পাচ্ছি'– ৬৫ বছরে জীবননাট্যের কাজী জহিরের এটাই ছিল শেষ সংলাপ। রাত তখন প্রায় সোয়া দশটা। পাশে বসে একজন তাঁর মাথা টিপে দিচ্ছিল। সংলাপটি শুধু সে-ই শুনতে পেরেছে। একথা বলার পরেই তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। শেষ সংলাপ উচ্চারণ করার আগে তাঁর মনের অবস্থা ছিল অত্যন্ত ফুরফুরে মেজাজের। আগের দিন মাত্র তিনি ভারতের বিড়লা থেকে হৃদরোগের চিকিৎসা করে এসেছেন। বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। পরিবারের সবাইকে বরাবরের মতো শাণিত কণ্ঠেই বলেছিলেন, 'এখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। পুরোদমে কাজ চালিয়ে যেতে পারবো'। কিন্তু তাঁর কণ্ঠ চিরকালের মতো স্তব্ধ হয়ে যায়। তিনি ২০শে অক্টোবর ১৯৯২ সকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে

মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়েন। আগের দিন রাতে তাকে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে নেওয়া হয়। এর আগে বাইপাস সার্জারির জন্য বিড়লা হাসপাতালে ১৮ দিন ছিলেন। ষাট দশকের এই বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা ঢাকার বাণিজ্যিক ছবির ক্ষেত্রে বড়ো ধরনের অবদান রয়েছে। অনেকেই তাকে বাঙালি মেজাজের সংগতিপূর্ণ ছবির নির্মাতা হিসেবে অভিহিত করেন।

কাজী জহির নিজেই বলতেন যে, 'শরৎচন্দ্র, নীহাররঞ্জন ও বঙ্কিমচন্দ্র যদি এদেশের পাঠকচিত্তে বেঁচে থাকেন তাহলে তিনিও দর্শকচিত্তে বেঁচে থাকবেন'।

কাজী জহিরের মধ্যে দ্বৈতসত্তা সক্রিয় ছিল। তাঁর বিভিন্ন অভিব্যক্তিতে অনেক সময় তা প্রকাশ পেয়ে যেত। যেমন তিনি এখন যে কথাটি বলেছেন, আধা ঘণ্টা পর দেখা যায় তাঁরই বিপরীত কথা বলেছেন। তিনি মনে করতেন বিরোধী-মৈত্রী সম্পর্কের ওপর বিশ্বচরাচর প্রতিষ্ঠিত। একবার কথা প্রসঙ্গে তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, এ দর্শনের প্রচারক ছিলেন ফরাসি দার্শনিক অঁরি বের্গসন। তিনি তাঁর মানস সন্তান হতে চাইছেন কি না? জবাবে তিনি হেসেছিলেন। তবে তাঁর ব্যক্তিগত এ চরিত্রের প্রতিফলন তাঁর কোনো ছবিতে পাওয়া যায়নি। যেহেতু তিনি তাঁর ছবির উপকরণ সংগ্রহ করেছেন শরৎ, বঙ্কিম এবং নীহার থেকে সেহেতু তিনি তাঁর জীবন দর্শনকে ছবিতে কাজে লাগাননি।

কাজী জহিরের মৃত্যুর পর চলচ্চিত্রের বিশিষ্টজনের অভিমত:

কাজী জহিরের সুপারহিট সিনেমা *ময়নামতি'র* নায়িকা করবীর মতে, 'কাজী জহির ছিলেন একজন চমৎকার পর্যবেক্ষক। তাঁর ছবি ছিল মূলত মেলোড্রামাভিত্তিক। ছবির নির্মাণশৈলী এবং সংলাপের মধ্য দিয়ে দর্শকদের নাড়ি ধরে টান দেওয়ার চেষ্টা করতেন'।

একজন প্রদর্শকের মতে, 'যারা সিনেমা দেখেন তাদের কেউ কাজী জহিরের অন্তত একটি ছবি দেখেননি এমন দর্শক কমই আছেন। প্রদর্শকরা খুব কমই সিনেমা হলে বসে ছবি দেখে থাকেন। কিন্তু কাজী জহিরের ছবি অনেকেই সিনেমা হলে বসে দেখতেন'।

খ্যাতিমান চলচ্চিত্র নির্মাতা এহতেশাম বলেন, 'আমরা চলচ্চিত্রের একজন স্টলওয়ার্টকে হারালাম'।

কাজী জহিরের অধিকাংশ ছবির নায়িকা শাবানা বলেন, 'কাজী জহির ছিলেন একজন যত্নশীল নির্মাতা। তিনি চিত্রনাট্যের প্রথম সংলাপ থেকে শেষ সংলাপ পর্যন্ত মুখস্থ জানতেন। তাঁর মতো দ্বিতীয় কোনো পরিচালক এদেশে নাই। *অবুঝ মন* ছবির মাধবী চরিত্রটি তিনি নিজের মনের মতো করে গড়ে তুলেছেন।'

উল্লেখ্য, কাজী জহিরের জন্ম ১৯২৭ সালের ১০ই অক্টোবর পুরান ঢাকার বংশালের আব্দুল্লাহ সরকার লেনের বিখ্যাত সাত বাড়িতে। বিশিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রার মৌলভী ইউসুফ ও বিবি আয়েশার ঘরে দুই ভাই দুই বোনের সংসারে কাজী জহির দ্বিতীয়। কাজী জহির শুধু চিত্র-প্রযোজক এবং পরিচালকই ছিলেন না, তিনি একজন প্রদর্শকও। ঢাকার তাঁতী বাজারের চিত্রামহল সিনেমা হলের মালিক তিনি। নায়িকা ও প্রযোজিকা চিত্রা জহির

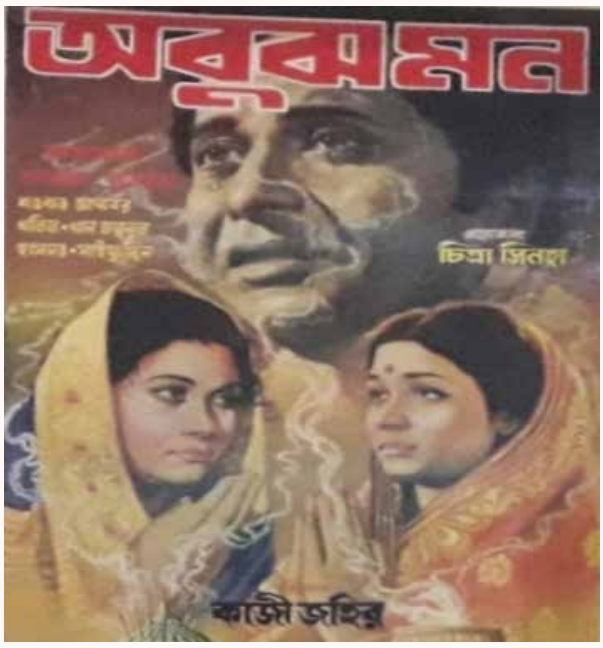

তাঁর স্ত্রী। কাজী জহিরের তিন ছেলেমেয়ে। পুত্র কাজী আজহার, দুই মেয়ে ঝিনুক ও শাপলা। ১৯৯২ সালের ২০শে অক্টোবর বিখ্যাত এই নির্মাতা মৃত্যুবরণ করেন।

কাজী জহির পরিচালিত চলচ্চিত্রগুলো:
১। *বন্ধন* (১৯৬৪)
২। *ভাইয়া* (১৯৬৬)
৩। *নয়ন তারা* (১৯৬৭)
৪। ময়নামতি (১৯৬৯)
৫। *মধুমিলন* (১৯৭০)
৬। *অবুঝ মন* (১৯৭২)
৭। *বধূ বিদায়* (১৯৭৮)
৮। *ফুলের মালা* (১৯৮৭)

কাজী জহির ও তাঁর চিত্রা ফিল্মস থেকে প্রযোজিত ছবিগুলো:
১। জহির রায়হান পরিচালিত *কখনো আসেনি* (১৯৬১)
২। সিরাজুল ইসলাম ভূঁইয়া পরিচালিত *দস্যুরাণী* (১৯৭৩)
৩। মোস্তফা মেহমুদ পরিচালিত *অবাক পৃথিবী* (১৯৭৪)
৪। বাবুল চৌধুরী পরিচালিত *চাষীর মেয়ে* (১৯৭৫)
৫। এফ.এ বিনু পরিচালিত *রাজরাণী* (১৯৭৬)
৬। আকবর কবীর পিন্টু পরিচালিত *কথা দিলাম* (১৯৮০)
৭। নূর মোহাম্মদ মনি পরিচালিত *রাণী চৌধুরাণী* (১৯৯০)
৮। কাজী হায়াৎ পরিচালিত *মিনিস্টার* (২০০৩)
৯। কাজী হায়াৎ পরিচালিত *আমার স্বপ্ন* (২০১০)
১০। জাকির হোসেন রাজু পরিচালিত অনেক *সাধের ময়না* (২০১৪)

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ইতিহাসের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন কাজী জহির। তিনি তাঁর চলচ্চিত্রের মাধ্যমে দর্শকের হৃদয়ে বেঁচে থাকবেন আজীবন।

আপন চৌধুরী: চলচ্চিত্র গবেষক, নির্মাতা ও লেখক
aponsopno22@gmail.com

মিষ্টি রোগের তিক্ত বাস্তবতা

ডা. মোহাম্মদ হাসান জাফরী

মিসেস শাহনাজ একজন মধ্যবয়সি গৃহিণী। কিছুদিন আগে থেকে তার হাত-পা অবশ লাগে, বেশি বেশি পানি পিপাসা লাগে। রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের কাছে গেলেন পরামর্শের জন্য। সেখানে রক্ত পরীক্ষা করে তার ডায়াবেটিস ধরা পড়ল। চিকিৎসক তাকে ওষুধ দিলেন। আর বলে দিলেন মিষ্টি জাতীয় খাবার কম খেতে, নিয়মিত হাঁটাচলা করতে। আমাদের দেশে এরকম বাস্তব ঘটনা শোনেননি এমন মানুষ হয়ত পাওয়া যাবে না। রক্তে সুগার বা মিষ্টির আধিক্যের এই তিক্ত অসুখ ডায়াবেটিস থেকে বাঁচতে সচেতনতার কোনো বিকল্প নেই।

ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র বা মধুমেহ একটি নন-কমিউনিকেবল (অসংক্রমণযোগ্য) রোগ, যা একবার হলে সম্পূর্ণ প্রতিকার করা সম্ভব নয় কিন্তু নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। বর্তমান বিশ্বে ডায়াবেটিস এক নীরব ঘাতক এবং সারা বিশ্বে এ সমস্যা বেড়েই চলেছে। ত্রিশ বছর আগের তুলনায় এই সংখ্যা এখন চার গুণেরও বেশি। ইন্টারন্যাশনাল ডায়াবেটিস ফেডারেশনের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে বর্তমানে ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি। অথচ এদের প্রায় অর্ধেকেরও বেশি জানে না, তাদের ডায়াবেটিস রয়েছে। জীবনযাত্রার পরিবর্তন, কায়িক শ্রম কমে যাওয়া, দুশ্চিন্তা বেড়ে যাওয়া সব মিলিয়ে ডায়াবেটিস হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়। রোগীদের সক্ষমতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে ডায়াবেটিস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

আমরা যখন কোনো খাবার খাই, তখন আমাদের শরীর সেই খাদ্যের শর্করাকে ভেঙে গ্লুকোজে রূপান্তরিত করে। অগ্ন্যাশয় থেকে ইনসুলিন নামক যে হরমোন নিসৃত হয়, তা আমাদের শরীরের কোষগুলোকে গ্লুকোজ গ্রহণ করতে সাহায্য করে। এই গ্লুকোজ শরীরের জ্বালানি বা শক্তি হিসেবে কাজ করে। শরীরে যখন ইনসুলিন তৈরি হতে না পারে অথবা এটা ঠিক মতো কাজ না করে, তখনই ডায়াবেটিস হয় এবং এর ফলে রক্তের মধ্যে গ্লুকোজ জমা হতে শুরু করে। সাথে চর্বির পরিমাণ বেড়ে যাওয়া, রক্তের প্রেশার বেড়ে যাওয়া ইত্যাদিও হতে পারে।

ডায়াবেটিস বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। তবে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, টাইপ-১ ও টাইপ-২। টাইপ-১ (Insulin Dependent Diabetes) ডায়াবেটিস সাধারণত ছোটো বয়সেই দেখা দেয় এবং প্রত্যহ ইনসুলিন গ্রহণ ছাড়া এর কোনো চিকিৎসা নেই, অর্থাৎ ইনসুলিন নিয়েই বেঁচে থাকতে হবে। তবে সাধারণত ৪০ বছর বয়সের দিকে ডায়াবেটিস ধরা পড়ে এবং অনেক সময় বংশ পরম্পরায় চলতে পারে। এই ডায়াবেটিসই টাইপ-২ (Insulin Non Dependent Diabetes) ডায়াবেটিস। তবে এ বয়সের মানুষের পাশাপাশি ছোটোদেরও ইদানীং ডায়াবেটিস লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং তা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

টাইপ-১ ডায়াবেটিসে অগ্ন্যাশয় থেকে ইনসুলিন উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। তখন রক্ত প্রবাহে গ্লুকোজ জমা হতে শুরু করে। এর পেছনে জিনগত কারণ থাকতে পারে অথবা অগ্ন্যাশয়ে ভাইরাসজনিত সংক্রমণের কারণে ইনসুলিন উৎপাদনকারী কোষগুলো নষ্ট হয়ে গেলে এমন হতে পারে। আর টাইপ-২ ডায়াবেটিসে যারা আক্রান্ত তাদের অগ্ন্যাশয়ে যথেষ্ট ইনসুলিন

উৎপন্ন হয় না অথবা এই হরমোনটি ঠিকমতো কাজ করে না। সন্তানসম্ভবা হলেও অনেক নারীর ডায়াবেটিস হতে পারে (Gestational Diabetes)। তাদের দেহ থেকে যখন নিজের এবং সন্তানের জন্য প্রয়োজনীয় ইনসুলিন যথেষ্ট পরিমাণে তৈরি হতে না পারে, তখনই তাদের ডায়াবেটিস হতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, সারা বিশ্বে প্রায় পনেরো শতাংশ গর্ভবতী নারীর ডায়াবেটিস হতে পারে। ডায়েট, শরীরচর্চা অথবা ইনসুলিন নেওয়ার মাধ্যমে তাদের শরীরে চিনির মাত্রা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা গেলে তাদের টাইপ-২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়।

ক্লান্তি বোধ করা ডায়াবেটিসের একটি বড়ো উপসর্গ। এছাড়া সাধারণ উপসর্গগুলোর মধ্যে রয়েছে বার বার পানি পিপাসা লাগা, বার বার ক্ষুধা লাগা, ঘন ঘন প্রসাব হওয়া (বিশেষ করে রাতের বেলায়); কোনো কারণ ছাড়াই ওজন কমে যাওয়া, প্রদাহজনিত রোগে বার বার আক্রান্ত হওয়া, দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যাওয়া, শরীরের কোথাও কেটে গেলে সেটা শুকাতে দেরি হওয়া ইত্যাদি। রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ ৭ mmol/L (খালি পেটে) এবং ১১.১ mmol/L (ভরা পেটে) হলে তখনই সে অবস্থাকে আমরা ডায়াবেটিস বলি।

রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেশি হলে রক্তনালির মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। শরীরে যদি রক্ত ঠিকমতো প্রবাহিত না হয়, তাহলে স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। এছাড়া দৃষ্টি শক্তিও হারাতে পারে। ইনফেকশন দেখা দিতে পারে পায়ে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, অন্ধত্ব, কিডনি নষ্ট হয়ে যাওয়া, হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক ইত্যাদির পেছনে একটি বড়ো কারণ ডায়াবেটিস। এছাড়া হাইপোগাইসেমিয়া, কিটোএসিডোসিস ইত্যাদি মারাত্মক জটিলতাও হতে পারে। হতে পারে পায়ের আলসার বা গ্যানগ্রিন, ফলে আঙ্গুল বা পা কেটে ফেলতে হতে পারে।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে শুধু ওষুধ বা ইনসুলিনই যথেষ্ট নয়। পাশাপাশি খাদ্যাভ্যাস এবং শৃঙ্খলাবোধের মাধ্যমে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। প্রক্রিয়াজাত খাবার ও পানীয় এড়িয়ে চলতে হবে। এড়িয়ে চলতে হবে ফাস্টফুড, চিনি জাতীয় পানীয়, মিষ্টি ইত্যাদি। শাকসবজি, ফল এবং মোটা দানার খাদ্যশস্যের মতো স্বাস্থ্যকর খাবার খেতে হবে। স্বাস্থ্যকর তেল, বাদাম খাওয়াও ভালো। যেসব মাছে ওমেগা থ্রি তেল আছে সেগুলো বেশি করে খেতে হবে। এক বেলা পেট ভরে না খেয়ে অল্প পরিমাণে বিরতি দিয়ে খেতে হবে। জীবনযাপনে শৃঙ্খলাই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের মূল চাবিকাঠি। শরীরচর্চা বা ব্যায়াম করার মাধ্যমে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কমিয়ে রাখা সম্ভব। প্রতি সপ্তাহে আড়াই ঘণ্টার মতো ব্যায়াম করা দরকার। শারীরিকভাবে থাকতে হবে সক্রিয়। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। ধূমপান পরিহার করাও জরুরি। নজর রাখতে হবে কোলেস্টেরলের মাত্রার ওপরও। এছাড়া গ্লুকোজ মেপে ডায়াবেটিসের আগের স্টেজ (প্রিডায়াবেটিস) ধরা পড়লেও তখন থেকেই এগুলো মেনে চলতে হবে।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের মেডিসিনের মধ্যে আছে মূলত ইনসুলিন, যা বিভিন্ন রোগীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাধ্যমে এবং ডোজে দেওয়া হয়। এছাড়া আছে মুখে খাওয়ার বিভিন্ন ওষুধ, যেমন সালফোনাইল ইউরিয়া, মেটফরমিন, লিনাগ্লিপটিন ইত্যাদি। এগুলো বিভিন্ন বিষয় বিবেচনায় রেখে একেক রোগীকে একেক ভাবে দেওয়া হয়। এম্পাগ্লিফ্লোজিন নামক ওষুধটি ডায়াবেটিসের পাশাপাশি হার্ট ফেইলিউরেও ব্যবহৃত হয়। এছাড়া নতুন ওষুধ টিরজেপাটাইড ডায়াবেটিসের পাশাপাশি স্থূলতায় (মেটাবলিক সিন্ড্রোম) ব্যবহার করা হয়।

ডায়াবেটিস সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এবং চিকিৎসা সেবা প্রদানে বাংলাদেশ সরকার এবং বিভিন্ন সংগঠন নানা কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। সরকারি হাসপাতালগুলোয় স্বল্প খরচে ডায়াবেটিসের টেস্টগুলো করার ব্যবস্থা আছে। সরকারি টারশিয়ারি হাসপাতালগুলোয় মেডিসিন বিভাগের পাশাপাশি এন্ডোক্রাইন (হরমোন) এবং ডায়াবেটিস বিভাগ চালু আছে, যা ডায়াবেটিস রোগীদের নিয়মিত চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাচ্ছে। ঢাকা মেডিকেলসহ দেশের বিভিন্ন মেডিকেলে ডায়াবেটিক ক্লিনিক চালু আছে। এছাড়া বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে বিভিন্ন মাঠ, পার্কগুলো হাঁটার উপযোগী করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এসব উদ্যোগ দেশের জনগণের স্বাস্থ্য রক্ষা এবং ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে শারীরিক পরিশ্রমের সুযোগের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

দেশে ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয় (তখন পাকিস্তান ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশন নামকরণ করা হয়)। ১৯৮২ সালে বারডেম বহুমূত্র প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে কমিউনিটিভিত্তিক কর্মসূচি গঠনের লক্ষ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগী কেন্দ্র হিসেবে দায়িত্ব লাভ করে। ইউরোপের বাইরে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান এটাই প্রথম। এছাড়া বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রচারের পাশাপাশি ধর্মীয় বিশ্লেষকদের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় আমাদের করণীয় বিশেষভাবে 'ডায়াবেটিস প্রতিরোধ' বিষয়ে একটি বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

ডায়াবেটিস এখন আর কোনো ছোটোখাটো অসুস্থতা নয়। এ রোগের ব্যাপারে জনগণকে আরও সচেতন করার জন্য আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবসে এ-বিষয়ক কর্মশালা, মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ, জনগণকে ডায়াবেটিস সম্পর্কে জানানো এবং সর্বোপরি সবার মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। সরকারের পাশাপাশি আমাদেরও এক্ষেত্রে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। সবাই মিলে সচেতন হয়ে এগিয়ে এলে আমরা ডায়াবেটিস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবো।

ডা. মোহাম্মদ হাসান জাফরী: প্রাবন্ধিক ও চিকিৎসক
jafri.drmc.dmc@gmail.com

রংপুর ডায়েরিঃ দায়িত্ব, ভ্রমণ আর স্মরণীয় স্মৃতি

হুসাইন মামুন

রেলওয়ে স্টেশনের হুইসেলের সঙ্গে শুরু হয়েছিল আমাদের তিন দিনের রংপুর যাত্রা। মূল উদ্দেশ্য ছিল রংপুর বিভাগীয় বইমেলা ২০২৫-এ অফিসিয়াল ডিউটি পালন। দুটি স্লটে মোট পাঁচজনের টিম– কাজের চাপ ছিল ঠিকই, কিন্তু নতুন শহর, নতুন পরিবেশ আর অবসরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফাঁকগুলো আমাদের ভ্রমণ-ভাবনাকে বার বার টেনে নিয়ে যায় বাইরে। কাজের পাশাপাশি আমরা ঘুরে দেখেছি রংপুরের ইতিহাস, ঐতিহ্য আর আধুনিকতার মিশেল থাকা কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্পট।

১৮ থেকে ২৫শে নভেম্বর– পুরো আট দিন জুড়ে রংপুর টাউন হলের পাবলিক লাইব্রেরি চত্বরে বসেছিল বইয়ের উৎসব। যেহেতু আমরা দ্বিতীয় স্লটে ছিলাম, তাই পৌঁছাই ২২শে নভেম্বর– বইমেলার সবচেয়ে ব্যস্ত সময়ে। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্টলের পাশাপাশি ছিল ভিন্ন ধরনের আয়োজন- বাহারি আইটেমের পিঠা মেলা। প্রতিদিন সন্ধ্যার পরে আয়োজন হতো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আয়োজন ছিল আঞ্চলিক ভাষার গান ও বিভিন্ন আন্তঃস্কুলের বিতর্ক প্রতিযোগিতাও। ২৫শে নভেম্বরের সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েই বুঝলাম রংপুরের সাহিত্য-সংস্কৃতির স্পন্দন কতটা জীবন্ত, প্রাণবন্ত। ডিউটির মাঝেই ঠিক করলাম–রংপুরে এসে ইতিহাস-ঐতিহ্য না দেখে ফিরে যাওয়া ঠিক হবে না। সেই ভাবনা থেকেই শুরু হলো আমাদের ঘুরে দেখার যাত্রা।

প্রথম দিন আমাদের যাত্রা শুরু হয়, ইতিহাসের নামকরা কারমাইকেল কলেজে। ১৯১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত কারমাইকেল কলেজ– প্রাচীন লাল ভবনের মহিমায় পা রাখতেই মনে হলো যেন সময় পেছনে ফিরে গেছে। প্রায় ৩২১ একর জায়গাজুড়ে বিস্তৃত বিশাল স্থাপনা, পুরানো বৃক্ষরাজি ও খোলা মাঠ– সব মিলিয়ে কারমাইকেল কলেজ যেন এক জীবন্ত ইতিহাস। কেউ মাঠে বসে আড্ডা দিচ্ছে, কেউ করিডোরে বই নিয়ে দাঁড়িয়ে–এই কলেজের পরিবেশে আছে এক ধরনের প্রশান্তি। বিস্তীর্ণ ক্যাম্পাস ঘুরতে ঘুরতেই মনে হলো, এমন জায়গায় পড়ালেখা করা সত্যিই সৌভাগ্য।

এরপর গেলাম বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়– নতুন প্রজন্মের উচ্চশিক্ষার বাতিঘরে। ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয় খুব দ্রুতই উত্তরবঙ্গের শিক্ষার্থীদের জন্য শক্তিশালী কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। ক্যাম্পাসে ঢুকতেই চোখে পড়ল আধুনিক ভবন, সাজানো-গোছানো পরিবেশ, ছাত্রছাত্রীদের ব্যস্ততা।

২১টি বিভাগ, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ৮ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী– সব মিলিয়ে পুরো ক্যাম্পাসটা একাডেমিক প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর। আমরা ঘুরে দেখলাম প্রশাসনিক ভবন, একাডেমিক ভবন, লাইব্রেরির সামনে খোলা প্রাঙ্গণ। ঘুরে দেখার সুযোগও হলো ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে শহিদ আবু সাঈদকে যেখানে হত্যা করা হয় সে স্থানটিও। তার নামে গেটের নামকরণও করা হয়েছে। দেখার সুযোগও হয়েছে সীমান্তে হত্যা হওয়া ফেলানী নামক মেয়েটির নামে নামকরণ করা হলও।

প্রথম দিনের ভ্রমণের সবচেয়ে স্মরণীয় স্থান ছিল তাজহাট জমিদার বাড়ি। বাইরে থেকে দেখলেই বোঝা যায়– এটি উত্তরবঙ্গের অন্যতম প্রত্নশিল্প। ইতালিয়ান মার্বেল সিঁড়ি, লাল ইট ও শ্বেতপাথরের ব্যবহার, বিশাল প্রাসাদের সামনে সবুজ মাঠ– সবকিছু এতটাই মনোমুগ্ধকর যে মনে হয় সিনেমার সেট। জাদুঘরে প্রবেশ করে দেখা গেল মুঘল যুগের পাণ্ডুলিপি, টেরাকোটা শিল্প, পুরানো হাতিয়ারসহ প্রায় ৩০০টি মূল্যবান নিদর্শন। জমিদারদের জীবনযাত্রার ছোঁয়া যেন এখনও ভবনের প্রতিটি স্তম্ভে লেগে আছে।

প্রথম দিনের এই ভ্রমণ শেষে আমরা চলে যাই বইমেলার ডিউটি পালন করতে। যথারীতি

চিকলি বিল, রংপুর

ডিউটি শেষে রেস্ট হাউসে ফেরার পালা। অফিস থেকে থাকার জন্য নির্ধারণ করে দেওয়া হয় কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)-এর রেস্ট হাউস। রাতে মাঝে মাঝে শিয়ালের ডাক শোনা আর ঠান্ডা নিস্তব্ধ পরিবেশে ঘুম বেশ আরামদায়ক ছিল। ঘুম ভেঙে আবার পরের দিন সকালে যাত্রা শুরু দ্বিতীয় দিনের।

দ্বিতীয় দিন সকালে আমরা রওনা দিলাম রংপুর শহর থেকে ১১ কিলোমিটার দূরের বিখ্যাত ভিন্নজগতের পথে। নামের মতোই, জায়গাটাতেও ছিল একেবারে অন্যরকম অভিজ্ঞতা। প্রায় ১০০ একর জমির এই বিনোদন কেন্দ্র শুধু শিশুদের নয়– বরং সব বয়সের মানুষের জন্য এক অনন্য অভয়াশ্রম। লেক, বৃক্ষরাজি, ওয়াকওয়ে, নৌকা ভ্রমণ, রোবট জোন, থ্রিডি মুভি, প্লানেটোরিয়াম, তাজমহল– কি নেই এখানে!

লোহার ব্রিজ পার হওয়ার পর একেবারে নতুন জগতে প্রবেশ করার অনুভূতি হলো। পাখির ডাক, গাছের ছায়া, লেকের ঢেউ– সব মিলিয়ে প্রকৃতি আর প্রযুক্তির সমন্বয়। এরপর আবারো বইমেলায় ডিউটি পালন এবং ডিউটি শেষে বিএডিসি-তে ফেরা।

তৃতীয় দিন আমরা ঘুরে দেখলাম রংপুরের ঐতিহ্য– সবুজ কারখানার অদ্ভুত কারুপণ্য রংপুর লিমিটেড, দেশীয় শতরঞ্জি শিল্পকে বিশ্বে তুলে ধরার প্রধান প্রতিষ্ঠান।

কারখানায় ঢুকেই চমকে গেলাম। এত বড়ো ভবন, তবু ভেতরে নেই কোনো এসি বা ফ্যান! স্থাপত্যের বিশেষ নকশার কারণে স্বাভাবিকভাবেই তাপমাত্রা শীতল থাকে। সাত তলাবিশিষ্ট ভবন পুরোটাই গাছপালা দিয়ে ঢাকা। স্থাপত্য নকশায় প্রতি ফ্লোরে ৪টি করে সুইমিং পুলের মতো পানির ব্যবস্থা রয়েছে, আছে- ঝর্ণার মতো পানির প্রতিফলন এবং উপরের অংশটা গ্লাস দিয়ে ঢাকা যেন ভবনটি সবসময় ঠান্ডা থাকে। ডাইনিং-এ ব্যবহৃত পানি পরিশোধিত করে ঐ একই পানি আবার চলে আসে প্রতি ফ্লোরে। এতে পানিরও অপচয় রোধ হচ্ছে। সবুজে ঘেরা ভবন, ঝুলন্ত লতা-পাতা, ছাদের বাগান 'নন্দিনী পার্ক', শ্রমিকদের বিশ্রামস্থল– সব মিলিয়ে এটি শুধু কারখানাই নয়, বরং পরিবেশবান্ধব এক শিল্পনগরী।

এখানে প্রায় সাড়ে চার হাজার কর্মচারী রয়েছে। যাদের মধ্যে- ৮৫% নারী এবং ১৫% পুরুষ কর্মচারী। তাদের জন্য রয়েছে একটি মিনি ক্লিনিক, যেখানে- ২ জন এমবিবিএস ডাক্তার ও নার্সসহ মোট ৫ জন কর্মরত রয়েছেন। কর্মচারীদের জন্য রয়েছে জেনারেল স্টোর, সেখান থেকে বাকিতে তাদের মাসিক শুকনা বাজার নেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। রয়েছে ৫০% ভর্তুকিতে ক্যান্টিনে খাবারের ব্যবস্থা।

ঝুট কাপড়, পাট, তুলা–সবকিছু মিলে শিল্পীর হাতে তৈরি হয় শতরঞ্জি। এখান থেকে রপ্তানি হয় ৫৫টিরও বেশি দেশে। শ্রমিকদের নিয়মিত কাজ করা, বুননের ছন্দ, রঙিন সুতা– সবকিছুই যেন এক চলমান শিল্পকর্ম। দেশি ও বিদেশি অসংখ্য অ্যাওয়ার্ডের ঝুড়ি রয়েছে কারুপণ্য রংপুর লিমিটেডের।

এরপর চলে যাই রংপুর ক্যান্টনমেন্ট এলাকার ভেতরে অবস্থিত প্রয়াস সেনা বিনোদন পার্ক-এর পরিচ্ছন্ন সৌন্দর্য্য যেন এক অন্যরকম অনুভূতি এনে দেয়। সামরিক পরিবেশের শৃঙ্খলা, পরিচ্ছন্নতা আর গাছপালায় ঘেরা সবুজ পরিবেশ– সব মিলিয়ে পার্কটিতে প্রবেশ করতেই চোখে পড়ে সুশৃঙ্খল এক শান্ত জগৎ।

মূল ফটক পেরিয়ে ঢুকতেই দেখা যায় প্রশস্ত রাস্তা, দুই পাশে সারি সারি গাছ, আর ঝকঝকে পরিষ্কার পরিবেশ। এখানে বেশ কিছু আকর্ষণীয় স্পট আছে– শিশুদের জন্য রাইড, লেকের পাশে হাঁটার পথ, ছোটো চিড়িয়াখানা, ফটো জোন আর বিশ্রামের জন্য সুন্দর ছায়াঘেরা বসার জায়গা।

সবচেয়ে ভালো লেগেছে জায়গাটির নিরাপদ ও প্রকৃতিবান্ধব পরিবেশ। মানুষ কম, ভিড় নেই– তাই শান্তভাবে বসে থাকা বা প্রকৃতি উপভোগ করার জন্য এটি আদর্শ। লেকের পাশে বসে আমরা বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়েছি; ঠান্ডা বাতাস, হালকা রোদ আর সামরিক এলাকায় নিশ্চুপতা– মনে হয়েছিল শহরের কোলাহল থেকে যেন কিছুটা দূরে এসে পড়েছি।

পার্কের ভেতরের বিভিন্ন জায়গার সৌন্দর্য দেখে ছবি তোলা থামানো যায় না। সব মিলিয়ে, প্রয়াস পার্কে কাটানো সময়টি ছিল খুবই প্রশান্তিময়– যেন কাজের ব্যস্ততার মধ্যে কিছুটা গভীর নিশ্বাস নেওয়ার সুযোগ।

এর পাশেই ছিল রংপুর কারুপণ্য বা শতরঞ্জিপল্লি। যার মধ্যে আছে বিভিন্ন ডিজাইনের ফ্লোর ম্যাট পাপোশ, টেবিল রানার-কভার, চাদর। লোভ সামলাতে না পেরে আমরা তিন জন কিনে নিলাম বেশ কয়েকটি। এবার আবার মেলায় যাওয়ার পালা এবং মেলা শেষে বিএডিসি রেস্ট হাউসে ফেরত।

চতুর্থ দিনের গন্তব্য ছিল চিকলির বিল– রংপুর শহর থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরের এক অসাধারণ প্রকৃতিক স্পট। সেখানে পৌঁছে প্রথম যে জিনিসটি আমাদের মন টেনে নিলো তা হলো নিস্তরঙ্গ ও স্বচ্ছ বিস্তীর্ণ জলরাশি। চিকলির বিল শহরের খুব কাছে হলেও জায়গাটি আশ্চর্যজনকভাবে নিরিবিলি। চারদিকে দূর পর্যন্ত ছড়ানো পানির বিস্তার, ধানক্ষেত, সরু পথ, আর ওপরে খোলা আকাশ–সব মিলিয়ে এটি প্রকৃতির কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য আদর্শ স্থান।

সকালের দিকে পৌঁছানোয় সূর্যের আলো তখনো নরম। পানির ওপর সেই আলো পড়ে চিকলি বিলকে আরও মায়াবী করে তুলেছিল। আমরা বিলের ধারে কিছুক্ষণ হাঁটলাম, ছবি তুললাম, আর নীরবতার মাঝে প্রকৃতির শব্দ শুনতে শুনতে সময় কাটালাম।

সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে এখানকার লোকাল ভাব ও প্রাকৃতিক স্বাদ– এই জায়গা পর্যটনমুখী না হওয়ায় কোলাহল কম, মানুষ কম, কোনো বাণিজ্যিকতা নেই। তাই প্রকৃতিকে ঠিক প্রকৃতির মতোই পাওয়া যায়। পাখির ডাক, হালকা বাতাস আর অসম্ভব শান্ত পরিবেশ– চিকলির বিল আমাদের ভ্রমণের শেষ দিনে এনে দিয়েছিল এক বিশেষ প্রশান্তি। মনে হয়েছিল, ব্যস্ত শহর থেকে একটু দূরে এমন জায়গায় এসে দাঁড়ানো মানে নিজের ভেতরের ক্লান্তিটাকে ধুয়ে ফেলা।

বাস স্ট্যান্ডে ফেরার সময় ছোট্ট একটি উপলব্ধি বার বার মনে হচ্ছিল–রংপুর শুধু একটি বিভাগীয় শহর নয়, এটি ইতিহাস, শিক্ষা, ঐতিহ্য, প্রকৃতি, শিল্প–সবকিছুর সমন্বয়ে এক পূর্ণাঙ্গ পর্যটন নগরী। এখানে আমাদের ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা চমৎকার।

বইমেলার ডিউটি আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল ঠিকই, কিন্তু এই তিন দিনে যে স্মৃতি আমরা নিয়ে ফিরেছি, তা নিঃসন্দেহে আমাদের ব্যস্ত জীবনের এক শান্ত, সুন্দর বিরতি হয়ে থাকবে।

হুসাইন মামুন: প্রুফরিডার, বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি ও অ্যাডহক, ডিএফপি

কর্মী নিয়োগে বাংলাদেশ-সৌদি আরব চুক্তি স্বাক্ষর

বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে সাধারণ কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ৬ই অক্টোবর রিয়াদে স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তিকে দুই দেশের মধ্যে শ্রমবাজার সম্প্রসারণ ও অভিবাসন ব্যবস্থার ইতিহাসে এক নতুন মাইলফলক হিসেবে দেখা হচ্ছে।

বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল এবং সৌদি আরব সরকারের পক্ষে মানবসম্পদ ও সামাজিক উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার আহমেদ বিন সোলাইমান আল-রাজী চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। সৌদি আরব ও বাংলাদেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছরের ইতিহাসে এটাই প্রথমবারের মতো সাধারণ কর্মী নিয়োগ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক চুক্তি। ১৯৭৬ সালে প্রথম বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবে শ্রমিক পাঠানো শুরু হয়। তখন থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় ৩০ লাখের বেশি বাংলাদেশি শ্রমিক সৌদি আরবে কাজ করছেন, যা বাংলাদেশের রেমিট্যান্স প্রবাহের সবচেয়ে বড়ো উৎস হিসেবে ভূমিকা রাখছে।

চুক্তি স্বাক্ষরের আগে দুই দেশের প্রতিনিধিদলের মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে ড. আসিফ নজরুল সৌদি কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান, যেন কর্মীদের অধিকার সুরক্ষিত থাকে, আকামা নবায়নের দায়িত্ব নিয়োগকর্তারা যথাযথভাবে পালন করে এবং দেশে ফেরত যেতে ইচ্ছুক কর্মীরা যেন দ্রুত এক্সিট ভিসা পায়। তিনি আরো বলেন, 'বাংলাদেশ থেকে দক্ষ কর্মী প্রেরণের আগে আমরা প্রশিক্ষণ ও স্কিল সার্টিফিকেশন নিশ্চিত করব। এর মাধ্যমে সৌদি আরব আরো গুণগত শ্রমশক্তি পাবে।' এছাড়াও বাংলাদেশে সৌদি বিনিয়োগে প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন, কর্মী নিয়োগে ডিজিটাল যাচাইকরণ ব্যবস্থা চালু, নারী কর্মীদের সুরক্ষা এবং অবৈধ দালাল চক্র দমনে যৌথ মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়।

প্রতিবেদন: অর্ণব বিশ্বাস

নিউমোনিয়া: কারণ, উপসর্গ ও প্রতিকার

ডা. নাজনীন নাওয়াল বিপাশা

নিউমোনিয়া হলো এক ধরনের ফুসফুসের প্রদাহ। আমাদের ফুসফুসের অ্যালভিওলি বা ছোটো ছোটো বায়ুথলিতে জীবাণুর সংক্রমণের ফলে এই প্রদাহের সৃষ্টি হয়। প্রতিবছর পৃথিবীতে লক্ষাধিক মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হন। বিশেষত শীতকালে শিশু ও বয়স্কদের মধ্যে এই রোগের প্রকোপ বেশি দেখা যায়। আক্রান্তদের মধ্যে মৃত্যুহার প্রায় ১৪-৩০%। তাই আমাদের জানতে হবে কীভাবে এই রোগ থেকে দূরে থাকা যায়, প্রতিরোধ করা যায় এবং দ্রুত নিরাময় করা যায়।

নিউমোনিয়ার কারণ

- **ব্যাকটেরিয়া:** স্ট্রেপটোকক্কাস নিউমোনিয়া (হিউমোকক্কাস), হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ-বি (HIB) এবং মাইকোপ্লাজম নিউমোনিয়া, ব্যাকটেরিয়াজনিত কারণে নিউমোনিয়া বেশি হয়ে থাকে।
- **ভাইরাস:** সাধারণ সর্দি (রাইনোভাইরাস), ফ্লু (ইনফ্লুয়েঞ্জা), COVID-১৯ (SARS-Cov-2) এবং শ্বাসতন্ত্রের অন্যান্য ভাইরাস (যেমন- রেসপিরেটরি সিনসাইটিয়াল ভাইরাস) নিউমোনিয়া ঘটাতে পারে।
- **ছত্রাক:** কিছু ক্ষেত্রে ছত্রাক দ্বারাও নিউমোনিয়া হতে পারে, তবে এটি তুলনামূলকভাবে কম ঘটে।
- **পরজীবী:** খুব কম ক্ষেত্রে পরজীবীও নিউমোনিয়ার কারণ হতে পারে।

কীভাবে সংক্রমণ ঘটে

সংক্রমণ সৃষ্টিকারী জীবাণু নাক বা মুখ দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের সাথে ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং সেখানে প্রদাহ তৈরি করে।

কারা ঝুঁকিতে আছেন

- ৫ বছর বা তার বেশি বয়স্করা;
- গর্ভবতী নারী;
- পুষ্টিহীন বা অপুষ্টিগ্রস্ত ব্যক্তিরা;
- যাদের দীর্ঘমেয়াদি রোগ আছে, যেমন– হাঁপানি, ডায়াবেটিস, কিডনি বা হৃদরোগ;
- যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল, যেমন– যারা কান্সারের চিকিৎসা নিচ্ছেন বা HIB আক্রান্ত।

নিউমোনিয়ার প্রতিরোধ এবং সঠিক চিকিৎসা শিশুদের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন কারণ তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এখনো পুরোপুরি গড়ে উঠেনি। শিশুদের উপসর্গ ভিন্ন ধরনের হতে পারে এবং সঠিক চিকিৎসা না হলে তাদের স্বাস্থ্য আরো গুরুতরভাবে ঝুঁকিতে পড়তে পারে।

নিউমোনিয়ার লক্ষণ

- কাশি বা কফ বা শ্লেষ্মা যুক্ত হতে পারে;
- জ্বর, ঠান্ডা লাগা এবং ঘাম হওয়া;
- শ্বাসকষ্ট বা দ্রুত শ্বাস নেওয়া;
- বুকে ব্যথা বিশেষ করে কাশি বা শ্বাস নেওয়ার সময়;
- খাবারের অরুচি;
- সারা শরীরে ব্যথা।

নিউমোনিয়ার চিকিৎসা

- অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ;
- কফ্ মেডিসিন ব্যবহার;
- জ্বরের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ;
- শ্বাসপ্রশ্বাসের হার অব্যাহত রাখা, দরকার হলে অক্সিজেন দিতে হয়;
- ব্যথানাশক মেডিসিন ব্যবহার।

নিউমোনিয়া রোগীদের যেসব খাবার প্রযোজ্য এবং অপ্রযোজ্য

নিউমোনিয়া রোগীদের জন্য সহজপাচ্য খাবার অতি জরুরি; যেমন- গরম দুধ, তাজা ফলের রস, ডাল, লেবু, সবুজ শাকসবজি, গরম স্যুপ ইত্যাদি। পক্ষান্তরে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের যেসব খাবার এড়িয়ে চলতে হবে; যেমন- ঠান্ডা পানি, ঠান্ডা খাবার, অতিরিক্ত লবণ জাতীয় খাবার ইত্যাদি।

শিশুদের জন্য বাড়তি কিছু পরামর্শ

- ৬ মাস পর্যন্ত বুকের দুধ খাওয়াবেন;
- নিউমোনিয়া ধরা পড়লে স্যুপ জাতীয় পানীয়, বেশি বেশি তরল খাবার খাওয়াবেন;

- ❖ লবণযুক্ত গরম পানির ভেপার দেবেন;
- ❖ প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুয়ায়ী সময়মতো অ্যান্টিবোয়োটিক দিন এবং কোর্স পুরোপুরি শেষ করুন;
- ❖ কক্ষের তাপমাত্রা স্বাভাবিক এবং ঘরটি উষ্ণ রাখুন;
- ❖ শিশুর শুয়ে থাকার জায়গাটি আরামদায়ক করুন, প্রয়োজনে মাথার নীচে হালকা বালিশ দিয়ে একটু উঁচুতে রাখুন যাতে শ্বাস নিতে সুবিধা হয়।

নিউমোনিয়া প্রতিরোধের উপায়

- ❖ প্রাপ্ত বয়স্ক এবং শিশুদের ফ্লু ভ্যাকসিন দেওয়া;
- ❖ ধোয়া ও ধুলাবালি এড়িয়ে চলা;
- ❖ পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করা;
- ❖ ধূমপান থেকে বিরত থাকা;
- ❖ মাস্ক ব্যবহার করা এবং নিয়মিত হাত ধোয়া;
- ❖ স্বাস্থ্যকর জীবনধারা মেনে চলা;
- ❖ পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও বিশুদ্ধ পানি পান নিশ্চিত করা।

বিশ্ব নিউমোনিয়া দিবস

প্রতিবছর ১২ই নভেম্বর বিশ্বজুড়ে পালিত হয় বিশ্ব নিউমোনিয়া দিবস। এই দিনটির মূল লক্ষ্য হলো– নিউমোনিয়া সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি করা এর প্রতিরোধের উপায় জানানো ও সময়মতো চিকিৎসার গুরুত্ব তুলে ধরা।

বিশ্ব নিউমোনিয়া দিবস ২০২৫-এর মূল প্রতিপাদ্য হলো– Child Survival বা 'শিশুর বেঁচে থাকা'। এই প্রতিপাদ্যের মাধ্যমে ৫ বছরের কম বয়সি শিশুদের নিউমোনিয়া থেকে রক্ষা করবে টিকাদান, পুষ্টি, দূষণমুক্ত বাতাস ও দ্রুত চিকিৎসা নিশ্চিত করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

নিউমোনিয়া একটি প্রতিরোধযোগ্য রোগ, কিছু সাধারণ অভ্যাস মেনে চললে এ রোগের ঝুঁকি অনেকাংশে কমানো সম্ভব। নিউমোনিয়া, প্রতিরোধে সচেতনতা হোক আমাদের অঙ্গীকার। সময়মতো টিকা, পরিচ্ছন্ন জীবনযাপন ও চিকিৎসা-ই পারে জীবন বাঁচাতে।

ডা. নাজনীন নাওয়াল বিপাশা: নবজাতক ও শিশুরোগ চিকিৎসক, পদ্মা জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা

সুস্থ মাটি ও টেকসই মৃত্তিকা: দেশ বিনির্মাণে অপরিহার্য

মায়মুনা খন্দকার

সুস্থ মাটি উদ্ভিদ বৃদ্ধি, জল পরিশোধন ও সঞ্চয়, কার্বন ধারণ এবং জীববৈচিত্র্যের জন্য অপরিহার্য। প্রাণের সূচনা হয়েছে মাটি ও পানি থেকে। আবার সকল প্রাণীরই বেঁচে থাকার অবলম্বন এই মাটি ও পানি। পৃথিবী নামক এ গ্রহকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য করে রেখে যাওয়ার শাশ্বত অঙ্গীকারের প্রেক্ষিতে মাটি ও পানির গুরুত্ব অপরিসীম। পৃথিবীতে হাজার হাজার বছর চাষাবাদ হয়েছে মাটির নিজস্ব উর্বরা শক্তিতে। তখন প্রয়োজন ছিল না বাড়তি কোনো সার ও কীটনাশকের। মাটিতে বিদ্যমান অনুজীব, মাটি ও পানির সমন্বিত মিথস্ক্রিয়ায় মাটি থাকত উর্বর। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে মাটি ও পানি দূষিত হচ্ছে। এছাড়াও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য বাড়তি খাদ্য চাহিদা মেটাতে ও শিল্পায়নের কারণে প্রতিনিয়ত মাটি ও পানি দূষিত হচ্ছে। বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে মাটি ও পানির সঠিক ব্যবহার করে খাদ্য উৎপাদন অব্যাহত রাখার মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ। কারণ বাংলাদেশে দ্রুত নগরায়ণ, শিল্পায়ন, জনসংখ্যার চাপ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব শহুরে মৃত্তিকার উপর সরাসরি প্রভাব ফেলছে।

বাংলাদেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি নিশ্চয়তা, গ্রামীণ জীবিকা, এমনকি জাতীয় অর্থনীতির মেরুদণ্ড-ই হলো কৃষি। এই কৃষির প্রাণকেন্দ্র মৃত্তিকা। কিন্তু আমাদের এ মূল্যবান সম্পদ ক্রমেই চাপে পড়ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে আবাদি জমি ক্রমশ কমে আসছে। শিল্পায়ন, নগরায়ণ, রাস্তাঘাট নির্মাণের ফলে কৃষিজমি অন্য খাতে চলে যাচ্ছে। মৃত্তিকা কেবল কৃষিজ উৎপাদনের ভিত্তি নয়, বরং এটি শহুরে জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সঠিক মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা শহরের বর্জ্য শোষণ, বৃষ্টির পানি ধারণ, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, বৃক্ষরাজি ও সবুজায়ন রক্ষা এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ণ, মাটি, পানি ও বায়ু দূষণ, অতিরিক্ত রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার ও বিভিন্ন বর্জ্য শহুরে মৃত্তিকার গুণাগুণ নষ্ট করছে।

শহুরে মৃত্তিকার একটি বড়ো সংকট হলো জৈব পদার্থের ঘাটতি। জৈব কার্বনের স্বল্পতার কারণে মৃত্তিকার গঠন দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং পুষ্টি ধরে রাখার ক্ষমতা নষ্ট হচ্ছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শিল্পবর্জ্য, ভারী ধাতু, প্লাস্টিক এবং অন্যান্য অজৈব রাসায়নিক উপাদান দ্বারা সৃষ্ট দূষণ। শিল্পাঞ্চল, ট্যানারি এবং অপরিকল্পিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কারণে শহরের মৃত্তিকা বিষাক্ত হয়ে পড়ছে, যা শুধু মাটির উর্বরতাই নষ্ট করছে না, বরং তা খাদ্য নিরাপত্তা এবং জনস্বাস্থ্যের জন্যও মারাত্মক হুমকি হয়ে উঠছে।

আর চিন্তার বিষয় এই যে, শিল্পাঞ্চলের আশপাশের মাটিতে সীসা, ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়ামের মতো ভারী ধাতুর উপস্থিতি নিরাপদ সীমা অতিক্রম করছে। শহরের খোলা জমিগুলো ক্রমশ কংক্রিটে পরিণত হচ্ছে, যার ফলে প্রাকৃতিক পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ব্যাহত হচ্ছে এবং সামান্য বৃষ্টিতেই জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে। মাটির প্রাকৃতিক পানি শোষণ ক্ষমতা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। একইসঙ্গে সবুজ এলাকা কমে যাওয়ায় শহরের তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে এবং নগরবাসীর জীবনযাত্রা ক্রমশ অস্বস্তিকর হয়ে উঠছে।

দ্রুত নগরায়ণের ফলে শহুরে মৃত্তিকার স্বাস্থ্য রক্ষা বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রয়োজন সুসংহত পরিকল্পনা, নীতিগত সমর্থন এবং নাগরিক অংশগ্রহণ। শহরের মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ করণীয় ও সুপারিশ বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। কারণ সুস্থ মৃত্তিকা শুধু খাদ্য উৎপাদনের জন্যই নয়, শহরের সামগ্রিক টেকসই উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। সুস্থ মাটি শহরের তাপমাত্রা কম রাখে, বৃষ্টির পানি ধারণ করে, দূষণ শোষণ করে, জীববৈচিত্র্য রক্ষা করে এবং মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য সবুজ পরিবেশ সৃষ্টি করে। তাই এবছরের বিশ্ব মৃত্তিকা দিবসের বার্তা আমাদের চোখ খুলে দেয়: শহর মানেই কংক্রিটের অরণ্য নয়; শহরকে প্রাণবন্ত রাখতে হলে মৃত্তিকাকে বাঁচাতে হবে।

আমাদের প্রত্যেককে মৃত্তিকা বাঁচানোর এই দায়িত্ব নিতে হবে-ব্যক্তি পর্যায় থেকে শুরু করে নীতিনির্ধারক, গবেষক, নগর পরিকল্পনাবিদ, কৃষিজীবী ও কৃষি সম্প্রদায় সবাইকে। নগর পরিকল্পনা ও অবকাঠামো উন্নয়নের প্রতিটি ধাপে মৃত্তিকার স্বাস্থ্য সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। নির্মাণশিল্প, সড়ক সম্প্রসারণ, আবাসন প্রকল্পসহ সকল উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়নের পাশাপাশি মৃত্তিকার সক্ষমতা

বিবেচনায় নিতে হবে। ভারী ধাতু দূষণমুক্তকরণ, বায়োচার ব্যবহার, জৈবসার ও কম্পোস্ট প্রযুক্তির উন্নয়নসহ শহর উপযোগী মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে। এছাড়া, সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে শহুরে বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তর করা যেতে পারে। নগর বর্জ্যের একটি বড়ো অংশ জৈব, যা কম্পোস্ট বা জৈবসারে রূপান্তর করা হলে শহরের মৃত্তিকার জৈব পদার্থের ঘাটতি পূরণ হবে। পাশাপাশি প্লাস্টিক ও ক্ষতিকর রাসায়নিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় কঠোর নীতিমালা প্রয়োগ করতে হবে।

এই করণীয়সমূহ বাস্তবায়িত হলে শহরের মৃত্তিকা শুধু দূষণমুক্ত ও উর্বরই হবে না, বরং টেকসই নগর জীবনের ভিত্তি গড়ে তুলবে। শহরের প্রতিটি নাগরিকের সম্মিলিত প্রচেষ্টা, নীতিনির্ধারকদের দূরদর্শী পরিকল্পনা এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রযুক্তি উদ্ভাবনে একত্রে কাজ করলে আগামী দিনের নগর হবে প্রকৃতি ও মানুষের জন্য সমানভাবে সুস্থ, সবুজ ও টেকসই।

কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং টেকসই উন্নয়নের সঙ্গে মৃত্তিকার স্বাস্থ্য সরাসরি সম্পর্কিত। শুধু গ্রামীণ কৃষিজমিতেই নয়, শহুরে অঞ্চলের মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনাও আজকের দিনে অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছে। তাই খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির জন্য আমাদের নগর কৃষিকে ঢেলে সাজাতে হবে। এক্ষেত্রে ছাদ কৃষি বা ছাদ বাগান একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাথে যৌথভাবে নগর কৃষি উৎপাদন সহায়ক (পাইলট) প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ছাদ কৃষি বা ছাদ বাগান সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নগর মৃত্তিকার গুণগত মান পর্যবেক্ষণও এই কার্যক্রমের একটি অংশ ছিল। পাশাপাশি নগরবাসীর মাঝে প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে, যাতে শহরাঞ্চলেও টেকসই কৃষি চর্চা ও সবুজায়ন বৃদ্ধি পায়।

তবে শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত পদক্ষেপই যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন নীতিগত ও সামাজিক উদ্যোগের। নগর পরিকল্পনায় মৃত্তিকা সংরক্ষণকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। পার্ক, জলাভূমি ও খোলা মাঠ রক্ষা করতে হবে এবং সবুজ বেষ্টনী গড়ে তুলতে হবে। শিল্পবর্জ্য ও রাসায়নিক দূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর আইন প্রয়োগ জরুরি। নগর বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে আধুনিকায়ন করে জৈব বর্জ্যকে সম্পদে পরিণত করতে হবে। পাশাপাশি ছাদ কৃষি, উল্লম্ব কৃষি ও নগর কৃষিকে উৎসাহিত করতে হবে, যাতে শহরের মানুষ নিজেরাই মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় অংশ নিতে পারে।

মাটির স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে পারলে মাটির আর্দ্রতা ও অণুজীব ফিরে আসবে, জীববৈচিত্র্য বাড়বে। সুতরাং এটি সহজেই বুঝা যাচ্ছে যে, মাটি শুধু জমি নয় এটি এক জীবন্ত বাস্তুতন্ত্র। তার প্রতি যত্ন নিলেই শহর হয়ে উঠবে আরও সুস্থ, সবুজ ও বাসযোগ্য। সঠিক ব্যবস্থাপনা, সবুজ অবকাঠামো ও দূষণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অসুস্থ নগর মাটিও আবার জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে। আজকের এই দিনে সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান– মাটিকে সম্পদ নয়, দায়িত্ব হিসেবে দেখুন। কারণ মৃত্তিকা পৃথিবীর প্রাণের অন্যতম ভিত্তি। মাটির উপর ভিত্তি করে আমাদের জীবন ও সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে। তাই এর গঠন, গুরুত্ব এবং ক্ষয় রোধে সচেতন হওয়া এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা আমাদের সকলের দায়িত্ব, বিশেষত খাদ্য নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য।

মায়মুনা খন্দকার: প্রাবন্ধিক

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং তথ্য অধিদফতর সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকমুক্ত ঘোষণা

বাংলাদেশ সচিবালয়কে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক (এসইউপি) মুক্ত ঘোষণা করার ধারাবাহিকতায় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং তথ্য অধিদফতর (পিআইডি)-কে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। এর আওতায় পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণকল্পে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক-এর ব্যবহার বন্ধ করার লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক সামগ্রীর পরিবর্তে নিম্নোক্ত প্রস্তাবিত বিকল্প পণ্যসামগ্রী ব্যবহারের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। প্লাস্টিকের ফাইল, ফোল্ডারের পরিবর্তে কাগজ যা পরিবেশবান্ধব অন্যান্য সামগ্রীর তৈরি ফাইল ও ফোল্ডার ব্যবহার করা; প্লাস্টিক ব্যাগের পরিবর্তে কটন/জুট ফেব্রিকের ব্যাগ ব্যবহার করা; প্লাস্টিকের পানির বোতলের পরিবর্তে কাঁচের বোতল ও কাঁচের গ্লাস ব্যবহার করা; প্লাস্টিকের ব্যানারের পরিবর্তে কটন ফেব্রিক, জুট ফেব্রিক বা বায়োডিগ্রেডেবল উপাদানে তৈরি ব্যানার ব্যবহার করা; দাওয়াত পত্র, ভিজিটিং কার্ড ও বিভিন্ন ধরনের প্রচার পত্রে প্লাস্টিকের লেমিনেটেড পরিহার করা; বিভিন্ন সভা/সেমিনারে সরবরাহকৃত খাবারের প্যাকেট যেন কাগজের তৈরি হয়/পরিবেশবান্ধব হয় সেটি নিশ্চিত করা; একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিকের প্লেট, গ্লাস, কাপ, স্ট্র, কাটলারিসহ সকল ধরনের পণ্য পরিহার করা; প্লাস্টিকের কলমের পরিবর্তে পেনসিল/কাগজের কলম ব্যবহার করা; বার্ষিক প্রতিবেদনসহ সকল ধরনের প্রকাশনায় লেমিনেটেড মোড়ক ও প্লাস্টিকের ব্যবহার পরিহার করা এবং ফুলের তোড়াতে প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করা। সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক সামগ্রীর পরিবর্তে প্রস্তাবিত বিকল্প পণ্যসামগ্রী ব্যবহারের জন্য তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং তথ্য অধিদফতরের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে নির্দেশক্রমে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় প্লাস্টিক মুক্তকরণের এ ঘোষণা দেওয়া হয়।

প্রতিবেদন: আলেয়া রহমান

ডায়াবেটিস: নীরব ক্ষয়

অ আ আবীর আকাশ

কিছু রোগ আছে, যেগুলো হঠাৎ এসে মানুষকে আঘাত করে। আবার কিছু রোগ আছে, যেগুলো নীরবে আসে। কোনো শব্দ করে না, কোনো হইচই তোলে না। ধীরে ধীরে শরীরের ভেতরে বাসা বাঁধে। প্রথমে চোখে পড়ে না, পরে বুঝতে দেয় যে সে কতটা ভয়ংকর। ডায়াবেটিস তেমনই এক রোগ। বাইরে থেকে দেখলে বোঝা যায় না, ভেতরে ভেতরে সে মানুষের জীবন চুষে খায়।

ডায়াবেটিসকে বলা হয় নীরব ঘাতক। এই কথাটা বইয়ে লেখা থাকলে যতটা সাধারণ মনে হয়, বাস্তবে তার চেহারা ততটাই নিষ্ঠুর। এই রোগের যন্ত্রণা বুঝতে হলে নিজে ভুগতে হয়, অথবা খুব কাছের কাউকে ধীরে ধীরে ভেঙে পড়তে দেখতে হয়। আমি সেই দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষ। কারণ আমার বড়ো বোন ফরিদা বেগম প্রায় বিশ বছর ধরে এই রোগের সঙ্গে লড়াই করছেন।

আমার বড়ো বোন

ফরিদা বেগম, বয়স পেরিয়েছে তেপ্পান্ন। এক মেয়ে, চার ছেলের মা। সংসারের সব ভার এক সময় তার দুই হাতে ছিল। তিনি কোনো চাকরি করেননি, কোনো অফিসে যাননি, কোনো পরিচয়পত্রে বড়ো কিছু লেখাও নেই। তিনি একজন গৃহিণী। কিন্তু এই শব্দটার ভেতরে যে কতখানি শ্রম, ত্যাগ আর নীরব দায়িত্ব লুকিয়ে থাকে, তা শুধু সংসারের মানুষই জানে।

আমাদের ছোটোবেলায় তিনি ছিলেন এক ধরনের ছায়া। মা রান্নাঘরে, বোন উঠানে। আমরা খেলতাম, তিনি নজর রাখতেন। কাঁঠালপাতায় সরিষার তেল মেখে কেরোসিন শিখায় ধরে রাখলে কালি পড়ে কাজল হতো, সে কাজলে আমাকে তার মনের রঙে সাজাতেন। আমরা অসুস্থ হলে তিনিই জেগে থাকতেন। আজ সেই মানুষটিকে যখন অসহায় হয়ে বসে থাকতে দেখি, তখন মনে হয় জীবন কত নিষ্ঠুর হতে পারে।

রোগের শুরু, অবহেলার শুরু

ডায়াবেটিস তার জীবনে হঠাৎ আসেনি। ধীরে ধীরে এসেছে। প্রথমে মাথাব্যথা, ক্লান্তি, বার বার প্রস্রাব। তখন আমরা গুরুত্ব দিইনি। গ্রামের মানুষ, সাধারণ অসুখ ভেবেছি। পরে পরীক্ষা করে জানা গেল, ডায়াবেটিস। তখন থেকেই শুরু হলো ওষুধ, ডাক্তার, হাসপাতাল।

উপজেলা হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল, ঢাকার ইবনে সিনা, ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল, ঢাকা মেডিকেল, বারডেম– কোথায় তিনি যাননি? তবুও ডায়াবেটিস এমন এক রোগ, যাকে শুধু ডাক্তার দেখালেই হয় না। চাই নিয়ম, চাই শৃঙ্খলা, চাই ধৈর্য। আর এই তিনটির অভাব হলে ডায়াবেটিস ভয়ংকর হয়ে ওঠে।

নীরব ঘাতকের আসল চেহারা

২০১৮ সাল। সেই দিনটার কথা ভাবলে আজও বুক কেঁপে ওঠে। মাগরিবের নামাজের আগে অজু করতে গিয়েছিলেন বোন। পুকুরের পাকা ঘাটলার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। পায়ের জুতার তলা ভেদ করে মাছের কাঁটার সামান্য একটি খোঁচা লাগে ডান পায়ের তলায়। সামান্য। খুবই সামান্য।

সাধারণ মানুষের কাছে এটা কিছুই না। হয়ত এক ফোঁটা রক্ত, একটু ব্যথা। কিন্তু ডায়াবেটিস রোগীর কাছে এই সামান্য খোঁচাটাই হয়ে উঠল মৃত্যুর দরজায় কড়া নাড়া।

কয়েক দিনের মধ্যেই পা ফুলে গেল। ভেতরে ভেতরে পঁচন শুরু হলো। পুঁজ জমল। যন্ত্রণা এমন পর্যায়ে গেল, যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। জীবনে প্রথমবার আমি আমার বড়ো বোনকে শিশুদের মতো হাউমাউ করে কাঁদতে দেখেছি। সেই কান্না কোনো অভিনয় ছিল না। সেটি ছিল অসহায় শরীরের আর্তনাদ।

একজন ভাই হিসেবে আমি তখন কিছুই করতে পারছিলাম না। শুধু তাকিয়ে দেখেছি। মুখ লুকিয়ে কেঁদেছি। মনে হয়েছে, এই কান্না যেন আমার নিজের শরীরের ভেতর থেকে বের হচ্ছে।

হাসপাতালের করিডোরে দাঁড়িয়ে থাকা

ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হলো। জেলা হাসপাতাল, বারডেম– সব জায়গায় একই কথা। পা কেটে ফেলতে হবে। সেই শব্দটা আজও কানে বাজে। ‘কেটে ফেলতে হবে’। কত সহজে বলা যায় এই কথা। কিন্তু একটা পা মানে শুধু একটা অঙ্গ না। একটা পা মানে চলাফেরা, আত্মসম্মান, স্বাধীনতা।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষ ভরসা নিয়ে যাই। রাত পেরিয়ে দিন, দিন পেরিয়ে রাত। অপারেশন থিয়েটারের সামনে দাঁড়িয়ে আছি আমি আর ভাগিনা। বোন ভেতরে। জানি না কী হবে।

শেষ পর্যন্ত অপারেশন হয়। পায়ের ওপরের সমস্ত পঁচা গোস্ত চেঁছে ফেলে দেওয়া হয়। ব্যান্ডেজ করে সিটে পাঠানো হয়। আমরা শুধু তাকিয়ে থাকি। দোয়া করি। আল্লাহর কাছে কান্না করি।

তেরো দিন পর ধীরে ধীরে নতুন গোস্ত গজাতে শুরু করে। সেই দিন মনে হয়েছিল, আল্লাহ এখনো আমাদের কথা শোনেন। আমার বোনের পা বেঁচে যায়। এই পা শুধু তার না, আমাদের সবার আশা হয়ে যায়।

চোখের আলো নিভে যাওয়া

কিন্তু ডায়াবেটিস থামে না। সে এক জায়গায় থেমে থাকতে জানে না। গত কয়েক মাস ধরে বোন বলতে শুরু করলেন, চোখে ঝাপসা দেখেন। আমরা ভেবেছি বয়সজনিত সমস্যা। কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি কিছুই দেখতে পারছিলেন না।

ঢাকা ইস্পাহানি চক্ষু হাসপাতালে নিয়ে যাই। পরীক্ষা হয়। ছানি অপারেশন লাগবে। লেন্স বসাতে হবে। প্রথমে ডান চোখ, পরে বাম চোখ। কিন্তু আবার সেই ডায়াবেটিস। নিয়ন্ত্রণে নেই। ভরা পেটে নয়-এর নীচে, খালি পেটে সাত-এর নীচে না নামলে অপারেশন সম্ভব না। তার রিপোর্ট বারো-তেরোতেই আটকে থাকে।

একজন মানুষ যখন দেখতে পায় না, তখন সে শুধু অন্ধ হয় না। সে ধীরে ধীরে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আমার বোন এখন খাবার চিনতে পারে না। ঘরের জিনিসে হোঁচট খায়। নিজের সন্তানদের মুখ দেখতে পারে না।

আমি দেখি, তিনি চুপচাপ বসে থাকেন। কথা কম বলেন। চোখে এক ধরনের শূন্যতা। এই শূন্যতা সবচেয়ে ভয়ংকর।

ডায়াবেটিস: শরীরের রোগ, মনেরও রোগ

ডায়াবেটিস শুধু শরীরকে আঘাত করে না। এটি মানুষের মনকেও ভেঙে দেয়। নিয়ম মেনে খাওয়া, পছন্দের খাবার ছাড়তে বাধ্য হওয়া, সারাক্ষণ হিসাব করে চলা– এই সবকিছু মিলিয়ে একজন মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

আমার বোনও ক্লান্ত। হাঁটতে পারেন না। ভালো কিছু খেতে পারেন না। দেখতে পারেন না। নিজের শরীরের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ নেই। এই অসহায়তা একজন মানুষকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়।

প্রতিকার ও সচেতনতা

ডায়াবেটিস সারানো যায় না, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এই কথাটা খুব সহজ। কিন্তু বাস্তবে কঠিন। নিয়মিত ওষুধ, ইনসুলিন, সঠিক খাদ্যাভ্যাস, হাঁটা, মানসিক চাপ কমানো– সবকিছু একসাথে দরকার। খাবারে মিষ্টি, চিনি, সফট ড্রিংকস বাদ দিতে হয়। ভাত কমাতে হয়। শাকসবজি, আঁশযুক্ত খাবার বাড়াতে হয়। নির্দিষ্ট সময়ে খেতে হয়। নিয়ম ভাঙলেই বিপদ।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সচেতনতা। পায়ের সামান্য ক্ষত অবহেলা করা যাবে না। চোখে ঝাপসা দেখলে দেরি করা যাবে না। নিয়মিত পরীক্ষা ছাড়া ডায়াবেটিসকে হারানো সম্ভব না।

আমার বোন, আমার প্রার্থনা

আমার বড়ো বোন আজ খুব অসহায়। আমি জানি না সামনে কী অপেক্ষা করছে। কিন্তু আমি এটুকু জানি, তিনি শুধু একজন রোগী নন। তিনি একজন মা, একজন বোন, একজন মানুষ। আমি আল্লাহর কাছে একটাই দোয়া করি– যিনি তার পা বাঁচিয়েছেন, তিনি যেন তার চোখের আলোও ফিরিয়ে দেন।

আর যারা এই লেখা পড়বেন, তাদের কাছে আমার অনুরোধ– ডায়াবেটিসকে অবহেলা করবেন না। আজ একটু সচেতনতা হয়ত কাল কাউকে এমন অসহায় হওয়া থেকে বাঁচাতে পারে।

এই লেখা আমার বোনের জন্য, আমার নিজের জন্য, আর সেই সব মানুষের জন্য, যারা নীরবে এই নীরব ঘাতকের সঙ্গে লড়াই করে যাচ্ছেন।

অ আ আবীর আকাশ: প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক,
abirnewsroom@gmail.com

মাসিক সভায় বক্তৃতা করছেন মহাপরিচালক মহোদয়

ডিএফপি'র বিশেষ কার্যক্রম নভেম্বর ২০২৫

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) নিয়মিত কাজের পাশাপাশি নভেম্বর মাসজুড়ে নানাবিধ প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম আয়োজনের মাধ্যমে দায়িত্বশীল ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। নভেম্বর মাসে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

মাসিক সভা

১৮ই নভেম্বর মহাপরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে তথ্য ভবনের সভাকক্ষে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় পূর্বের সর্বশেষ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। তাছাড়া নিয়োগবিধি অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সভা শেষে সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ ২০২৫ ও ফিচার লেখায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

রাজশাহী বিভাগীয় বইমেলা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে রাজশাহী বিভাগীয় বইমেলা ২০২৫ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতা এবং জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের উদ্যোগে ৯ দিনব্যাপী এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলাটি ৩১শে অক্টোবর ২০২৫ তারিখে শুরু হয়ে এবং ৮ই নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত চলে। রাজশাহীর ঐতিহাসিক কালেক্টরেট মাঠে বিভাগীয় এই মেলার আয়োজন করা হয়। মেলা প্রতিদিন বিকেল ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। তবে ছুটির দিনগুলোতে মেলা শুরু হয় বেলা ১১টায়। মেলায় মোট ৮১টি স্টল ছিল; যার মধ্যে ১১টি সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ৭০টি বেসরকারি প্রকাশনা সংস্থা অংশগ্রহণ করে।

বইমেলা চলাকালীন প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন বিষয়ের ওপর যৌক্তিক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। মেলাটি সফলভাবে সম্পন্ন করার মাধমে রাজশাহীর

পাঠকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যায়। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) এ মেলায় অংশগ্রহণ করে সফলভাবে সমাপ্ত করে।

নবারুণ বই বিতরণ

রাজশাহী বিভাগীয় বই মেলায় চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের অংশগ্রহণের পাশাপাশি রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলায় ২৬ নং চকদুর্লভপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে *নবারুণ* পত্রিকা বিতরণ করা হয়। এ সময় স্কুলের অ্যাসেম্বলিতে বই পেয়ে শিক্ষার্থীরা ছিল উল্লাসিত।

রংপুর বিভাগীয় বইমেলা

১৮ থেকে ২৫শে নভেম্বর– পুরো আট দিন জুড়ে রংপুর টাউন হলের পাবলিক লাইব্রেরি চত্বরে আয়োজিত হয় রংপুর বিভাগীয় বইমেলা। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতা এবং জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের উদ্যোগে এই মেলার আয়োজন করা হয়। মেলা প্রতিদিন বিকেল ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। তবে ছুটির দিনগুলোতে মেলা শুরু হয় বেলা ১১টায়। মেলায় বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্টলের পাশাপাশি ছিল ভিন্ন ধরনের আয়োজন– বাহারি আইটেমের 'পিঠামেলা'। প্রতিদিন সন্ধ্যার পরে মেলা প্রাঙ্গণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন মেলার আকর্ষণ বাড়িয়ে দিত।

এছাড়া আয়োজন ছিল রংপুরের আঞ্চলিক ভাষার গান ও বিভিন্ন আন্তঃস্কুলের বিতর্ক প্রতিযোগিতাও। বইমেলা চলাকালীন রংপুরের পাঠকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যায়। প্রতিটি বইমেলায় ডিএফপির নিজস্ব প্রকাশনার উপস্থাপন, প্রচার ও বিক্রি ছিল উল্লেখযোগ্য।

প্রতিবেদন: সিনিয়র সম্পাদক, সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ, ডিএফপি

বিরহ বিলাপ

জসীম আল ফাহিম

আমাদের বাবু ভাই খাটো মানুষ ছিলেন বলে বন্ধুরা তাকে 'বাটুন' বলে ডাকত। দৈহিক উচ্চতায় খাটো হলেও মেধার দিক দিয়ে তিনি ছিলেন সকলকে ছাড়িয়ে। আমার এ চাচাতো ভাইটি দাদা ভাইয়ের বড়ো নাতি বলে বড়ো আদর করে তার নাম রেখেছিলেন– 'বাবু'। বাবু ভাই শ্যামবর্ণের, ডানপিটে স্বভাবের ছিলেন। তিনি যে অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র, পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে বৃত্তি লাভ তার প্রমাণ। শুধু তা-ই নয়, এসএসসিতে ভালো রেজাল্ট করে তিনি সকলকে রীতিমতো চমক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। ঢাকা বোর্ডে স্ট্যান্ড করেছিলেন। পরবর্তীতে এইচএসসিতেও তিনি স্টার মার্ক লাভ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও বাবার আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য বাবু ভাই দেশসেরা কোনো কলেজে ভর্তি না হয়ে হলেন স্থানীয় একটি কলেজে।

বাবু ভাইদের পাশের গ্রামেই ছিল পরি আপুদের বাড়ি। পরি আপু ছাত্রী তেমন ভালো ছিলেন না। ছাত্রী হিসেবে তিনি ভালো না হলেও দেখতে-শুনতে ছিলেন ঠিক পরির মতোই সুন্দরী! পরি আপু নিজের রূপ-সৌন্দর্যের ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। বাস্তববাদী স্বভাবের মেয়ে। পড়তেন বাবু ভাইদের কলেজেই। কলেজের ছেলেরা পরি আপুর রূপের প্রশংসায় ছিল পঞ্চমুখ।

মানুষের মন ভারি অদ্ভুত! যে-দিক খুশি আপন ইচ্ছায় ছুটে যেতে চায়। মন যেন বাধ মানতে নারাজ। চিরকাল স্বাধীনতা পিয়াসী মন কখনো হয়ে যায় অবুঝ। কখনো আবার লাগাম ছাড়া। মন তখন পতঙ্গের ন্যায় জ্বলন্ত প্রদীপে ঝাঁপ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। আমাদের বাবু ভাইও তেমনি একদিন ঝাঁপ দিয়েছিলেন। কবে, কী করে যে তিনি পরি আপুর রূপসাগরে ডুবে গেলেন, তা নিজেও হয়ত জানতেন না। ছাইচাপা আগুনের ন্যায় মনের আকুতি মনের কোণেই গোপন রেখেছিলেন এতদিন। পরি আপুর কাছে কোনোদিন তা প্রকাশ করতে চাননি।

পরি আপু কিন্তু বাবু ভাইয়ের সাথে সবসময় স্বাভাবিক আচরণই করতেন। সুদর্শনা, প্রফুল্লমনা, স্মার্ট ও আধুনিকা পরি আপুর এই স্বাভাবিক আচরণের জন্য কলেজের অনেক ছেলেই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ত। অনেকে তাকে নিয়ে স্বপ্নও দেখত। যতসব অবান্তর রঙিন স্বপ্ন যাকে বলে আরকি! অনেকেই তার সাথে কিছু একটা সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে চাইত। পিছু পিছু ঘুরত। চতুর বুদ্ধিমতী পরি আপু সবই বুঝতেন। তাই তিনি মেপে মেপে কৌশল করে চলতেন। কারও সাথে অযাচিত সম্পর্ক গড়া থেকে বিরত থাকতেন। ব্যাপারটা ভেবে মাঝেমধ্যে পরি আপু খুব মজাও পেতেন। কিন্তু কলেজের ছেলেগুলো বোকা কি না কে জানে। কোথায় ওরা নিজেদের জীবন নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাববে। তা না করে শুধু পরি আপুর পেছনেই ঘুরে বেড়ায়। তখন কী আর করবেন পরি আপু? ছেলেরা যদি অবুঝ হয়, তার কী-ই বা করার আছে?

প্রায় দিন পরি আপু বাবু ভাইদের বাড়ি আসতেন। বাবু ভাই মেধাবী ছাত্র। নোটপত্র এবং পড়াশোনার ব্যাপারে তিনি খুব

সিরিয়াস ছিলেন। একটু ভালো পরামর্শ লাভের আশায় পরি আপু হয়ত তাদের বাড়ি আসতেন। কোনো কোনোদিন দীর্ঘ সময় বসে দুজন গল্পগুজব করতেন। বাবু ভাই এবং পরি আপুর এ বন্ধুত্বকে বাড়ির সকলে স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিয়েছিলেন।

দাদা ভাই বাড়ির পেছনে বড়ো সাধ করে একটা কদমগাছ লাগিয়েছিলেন। গাছ ভরে কদম ফুল ধরেছিল গাছে। বাবু ভাই সেদিন অনেক সাধ করে পাঁচটি কদম ফুল দিয়ে একটি তোড়া সাজালেন। পরে তোড়াটি নিয়ে তিনি পরি আপুর জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকেন। মনে মনে স্রষ্টার ওপর বিচারের ভার ছেড়ে দিয়ে বলেন– পরি আপু যদি তাকে ভালোবেসে থাকে, তাহলে যেন আজ তিনি বাবু ভাইদের বাড়ি আসেন। স্রষ্টার খেলা বুঝা বড়ো দায়। পরি আপু সেদিন ঠিকই বাবু ভাইদের বাড়ি এসেছিল। বাবু ভাইও তার সাধের ফুলের তোড়াটি পরি আপুকে সঁপে দিয়েছিলেন।

সেদিন বিকেল বেলা, বাবু ভাই পরি আপুদের গ্রামের পথ ধরে হাঁটছিলেন। পথেই তিনি দেখতে পেলেন, তার দেওয়া সেই ফুলের তোড়াটি পরি আপুর বোন-ছেলের হাতে। দুরন্ত ছেলেটি ফুলগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেলা করছিল। দৃশ্যটি দেখে মনের মাঝে কেমন যেন একটা ধাক্কার মতো খেলেন বাবু ভাই। তার এত সাধের ফুলের তোড়াটির এই কী হাল হলো! মনে মনে তিনি ভাবলেন, তবে কী এ জীবনে তার পরিকে পাওয়া হবে না!

পরদিন কলেজে গিয়ে তিনি পরি আপুকে বিষয়টা জানালেন। শুনে পরি আপু দুঃখ প্রকাশ করলেন। লজ্জিতও হলেন। ক্লাস শেষ হলে দুজন নদীর ধারে বেড়াতে গেলেন। কিছু সময় তারা নদীর তীরে ঘুরে বেড়ালেন। হেঁটে হেঁটে বেশ কিছুক্ষণ তারা পায়চারি করলেন।

কথাচ্ছলে বাবু ভাই পরি আপুকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'সত্যিই তুমি খুব সুন্দরী! জীবনে তো কখনো পরি দেখিনি– হয়ত তোমার মতোই সুন্দরী হবে। কেন তুমি এত সুন্দরী হলে পরি?'

বাবু ভাইয়ের মুখে নিজের প্রশংসা শুনে পরি আপু যেন একেবারে গলে গেলেন। বলেন, 'বাবু, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। তোমার মনের ভেতর আসলে অনেক ভাব। ভাবনাগুলো কাজে লাগাও। আমি হলফ করে বলছি, তুমি একদিন অনেক বড়ো মাপের কবি হবে।'

পরি আপুর কথাবার্তা সবসময় কেমন যেন রহস্যময় মনে হতো। ছেলেদের কেউ কেউ তা ঠিকই বুঝতে পারত। বাবু ভাই নিজেও বুঝতেন। কিন্তু করবেন কী? যাকে মন থেকে ভালোলাগে, হৃদয়ের কাগজে যার ছবি আঁকা হয়ে যায়; তার উপহাসও যে-প্রেমিকের কাছে মধুর মনে হয়। সেদিন হাঁটতে হাঁটতে দুজন চৌরাস্তার মোড়ে চলে এলেন। এই মোড়টার নাম 'লাভ পয়েন্ট'। ওখান থেকে দুজন ঘরের টানে দু-দিকে চলে গেলেন।

দুপুরে খাওয়া সেরে বাবু ভাই বিছানায় একটু কাত হলেন। ঠিক তখনি তার মনের আরশিতে ভেসে উঠে পরি আপুর সেই অপরূপ মুখাবয়ব। বাবু ভাইয়ের কাছে ওর মুখাবয়ব পূর্ণিমার চাঁদ বলেই মনে হলো। মনে হলো– পরি আপুর চোখ জোড়া যেন জলে ভাসা পদ্ম! ঠোঁট জোড়া যেন গোলাপ ফুলের পাপড়ি! আর কণ্ঠে যেন স্বর্গীয় সুধা ঝরে! এমন সুন্দর মুখপানেই তো হাজার বছর চেয়ে থাকা যায়। হাজার বছর চেয়ে থাকলেও বুঝি পলক পড়তে চাইবে না। এমন সুন্দর মুখটি স্রষ্টা যেন শুধু ভালোবাসার জন্যই তৈরি করেছেন। ভাবতে ভাবতে বাবু ভাইয়ের দু-চোখে তন্দ্রা নেমে এলো। ঘুম থেকে জেগে তিনি অত্যন্ত আবেগঘন একখানা কবিতা রচনা করে ফেললেন। প্রেমে পড়লে যে-ছেলেরা সত্যি সত্যি কবি হয়ে উঠে বাবু ভাই যেন তারই প্রমাণ দিলেন।

পরদিন কলেজে গিয়ে তিনি পরি আপুকে কবিতাটি উপহার দিলেন। সাথে একটি গোলাপ ফুলের কলিও। উপহার পেয়ে তো পরি আপু ভারি অবাক। আশ্চর্য হয়ে বলেন, 'আমার জন্য কবিতা! বাহ্ চমৎকার তো! কবিগিরি তাহলে শুরু করে দিলে! চালিয়ে যাও। জীবনানন্দকে যে হারাবার মতলব এঁটেছো, বুঝতেই পারছি।'

বলে তিনি হো-হো করে হেসে উঠলেন। পরে তিনি গোলাপ কলিটি খোঁপায় পরতে পরতে বলেন, 'বাবু। মন থেকে বলছি ভাই। সত্যিই তুমি খুব ভালো একজন মানুষ। তোমার মনটা সত্যিই সুন্দর। তুমি জীবনে অনেক সুখী হবে।'

প্রিয়জনের মুখে নিজের প্রশংসা শুনলে সব মানুষই পুলকিত হয়। আহ্লাদিত হয়। বাবু ভাইও হলেন। পুলকিত হয়ে তিনি বলেন, 'চলো না পরি একবার মধুবন থেকে ঘুরে আসি। শুনেছি ওখানকার গাছগুলোয় কৃষ্ণচূড়া আর পলাশ ফুলে রঙিন হয়ে আছে। গেলেই দেখতে পাবে।'

কথাগুলো বলে বাবু ভাই পরি আপুর একটা হাত চেপে ধরলেন। পরি আপু কোনো আপত্তি করল না। মধুবনে এসে একটি স্টোন বেঞ্চে দুজন বসলেন। ছোটো একটা ছেলে এক প্যাকেট বাদাম দিয়ে গেল। আশপাশের গাছে ছোটো ছোটো রং-বেরঙের পাখি নানান সুরে গান ধরল। প্রেম করার জন্য নিশ্চয়ই এরচেয়ে মনোরম পরিবেশ আর হয় না। কাছেই দুটি নীল রঙের পাখি একটি গাছের চিকন ডালে বসে সোহাগ বিনিময় করছিল। পরি আপু ইশরায় দৃশ্যটি বাবু ভাইকে দেখালো। সত্যিই দেখার মতো দৃশ্য। নিজ চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবার নয়। বাবু ভাই বললেন, 'পরি, ডোন্ট মাইন্ড প্লিজ। আমি তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।'

পরি আপু একটু গম্ভীর হয়ে বলেন, 'কী এমন কথা! বলোই না শুনি।'

বাবু ভাই ভরসা পেয়ে বলেন, 'আচ্ছা পরি। তুমি কখনো প্রেমটেম করেছো?'

বাবু ভাইয়ের কথা শুনে পরি আপু সহসা হেসে উঠলেন। বললেন, 'না-রে ভাই। সেই সৌভাগ্য এখনো আমার হয়নি। তা তুমি করেছো নাকি?'

বাবু ভাই মুখে কাঁচুমাচু ভাব এনে বলেন, 'না-করিনি। তবে মনের মতো মানুষ একজন পেয়েছি। সাধ্যমতো প্রেম নিবেদনের চেষ্টাও করে যাচ্ছি।'

শুনে পরি আপু উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। বলেন, 'আচ্ছা, বাবু। মেয়েটির একটু পরিচয় দেবে? কে সেই সৌভাগ্যবতী! যে-আমাদের ক্লাসের সব থেকে সেরা ছাত্রটিকে বেছে নিয়েছে। নামদাম কী তার। থাকে কোথায়?'

বাবু ভাই জবাবে বলেন, 'না-গো না। এখনই তা বলা যাবে না। সময় হলে সবার আগে তুমিই জানতে পারবে।'

এদিকে ক্লাস শুরুর ঘণ্টা বাজল। পরি আপু বাবু ভাইকে নিয়ে ক্লাসে ঢুকলেন। দিন দিন বাবু ভাই আর পরি আপুর মধ্যে বন্ধুত্বটা গাঢ় থেকে গাঢ়তর হতে লাগল। সামনে ডিগ্রি ফাইনাল পরীক্ষা। আদাজল খেয়ে ওরা প্রস্তুতি নিতে লাগলেন।

এরইমধ্যে পরি আপুর বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। শহুরে পাত্র। সরকারি কলেজের প্রভাষক। আসছে বৃহস্পতিবার পরি আপুর গায়ে হলুদ। পরদিন শুক্রবার বিয়ে। আজ মঙ্গলবার। এরইমধ্যে পরি আপুদের বাড়িতে একটা সাজ সাজ আবহ তৈরি হয়ে গেল। সকলের মনেই মৌন আনন্দ বিরাজ করতে লাগল।

পরি আপুর গায়ে হলুদের খবরটা বাবু ভাই ইতোমধ্যেই পেয়ে গেছেন। খবর পেয়ে তিনি আর দেরি করলেন না। পরি আপুদের বাড়ি ছুটে গেলেন। বাবু ভাইকে দেখে পরি আপু খুবই খুশি হলেন। বাবু ভাইকে নিয়ে তার পড়ার কক্ষে বসালেন। বাবু ভাইয়ের মাঝে কেমন যেন একটা উতলা ভাব লক্ষ করলেন পরি আপু। জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে বাবু! এত অস্থির লাগছে কেন তোমাকে? কোনো সমস্যা? খুলে বলো তো শুনি।'

বাবু ভাই ভনিতা না করে বললেন, 'শুনলাম আসছে শুক্রবার তোমার বিয়ে। পরীক্ষা দিচ্ছো না নাকি?'

পরি আপু বললেন, 'খবর ঠিকই শুনেছ। তবে পরীক্ষা না দেয়ার সিদ্ধান্ত এখনো নিইনি।'

পরি আপুর কথা শুনে বাবু ভাই একটু গম্ভীর হয়ে রইলেন। বললেন, 'পরি, তুমি সেদিন যখন আমার প্রিয়ার পরিচয় জানতে চেয়েছ, আমি বলতে পারিনি। কিন্তু আজ আমি তোমাকে সব খুলে বলব। আজ আর লুকিয়ে কোনো লাভ নেই।'

পরি আপু কিছুটা থমকে গেলেন। ভারি অবাকও হলেন। বললেন, 'বলো না শুনি। শোনার জন্যই তো আমি আগ্রহ নিয়ে বসে আছি। জলদি বলো শুনি।'

'হায় পরি! তুমি আজও জানতে পারলে না, আমার প্রিয় মানুষটি কে? আমি এত ভালোবাসলাম! কত স্বপ্ন দেখলাম! সবই কী মিছে হয়ে যাবে! তাহলে যে-আমি মরে যাব পরি। সত্যি বলছি আমি মরে যাব।'

কথাগুলো বলে বাবু ভাই কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়লেন। পরি আপু একটু নীরব হয়ে থেকে বলেন, 'বাবু! তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তোমার আসলে হয়েছে কী?'

বাবু ভাই বলেন, 'না, আর লুকাবো না। বিশ্বাস করো পরি। আমি যে-এতদিন শুধু তোমাকেই ভালোবাসতাম। এখনো আমি তোমাকেই ভালোবাসি। আমি তোমাকে পেতে চাই পরি। চির আপন করে, আমার জীবনসঙ্গী করে চিরদিন তোমাকে কাছে পেতে চাই। তুমিই আমার প্রথম এবং শেষ প্রেম পরি। বিশ্বাস করো– তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না। তোমাকে ছাড়া আমার জীবনের কোনো মূল্য হয় না পরি। জীবনে-মরণে আমি শুধু তোমাকেই চাই।'

পরি আপু বলেন, 'ছেলেদের এত আবেগপ্রবণ হলে চলে না বাবু। জীবন অনেক বড়ো। তোমার সামনে এখনো অনেক কাজ বাকি পড়ে আছে। ওসব তোমাকে সম্পন্ন করতে হবে। পাগলামো করো না বাবু। প্লিজ, এখন বাড়ি যাও।'

বাবু ভাই বলেন, 'আমার অশান্ত মনটাকে শান্ত করব কেমন করে পরি? আমার কাছে আজ জীবনটাকে বড়ো তুচ্ছ মনে হচ্ছে। আমি এখন কী করব? বলো না পরি। তুমি আমাকে একটা কিছু বলো।'

বাবু ভাইয়ের আবেঘময় কথাবার্তা শুনে পরি আপু কেমন যেন ভাবনায় পড়ে গেলেন। এদিকে গায়ে হলুদের আর মাত্র একদিন বাকি। মনে মনে ভাবলেন তিনি– বাবু এখন অবুঝের মতো আচরণ করছে। এ মুহূর্তে সে যা খুশি তা-ই করতে পারবে। আমার সামনে গুরুদায়িত্ব। তা বিয়ে সংক্রান্ত না হলে বরং একটা কথা ছিল। এমতাবস্থায় নিজেকে বাবুর মতো অবুঝ বানালে চলবে না। বিষয়টা নিয়ে পরি আপু গভীরভাবে ভাবলেন। বুঝতে পারলেন– বাবু ভাই সত্যিই সিরিয়াস। কিন্তু কিছু কিছু বিষয় নিয়ে এত সিরিয়াস হওয়া যে মানায় না। এ কথাটা এখন কে বুঝাবে বাবুকে? আর বুঝালেই কী সে বুঝবে? বুঝবে না। এ অবস্থা থেকে ওকে ফেরাতে হলে তার প্রতি বাবুর কিছু একটা বিরূপ মনোভাব তৈরি করতে হবে। ভেবে তিনি বাবু ভাইয়ের সাথে নির্মম এক অভিনয়ে মেতে উঠলেন।

রাগত কণ্ঠে তিনি বলেন, 'দেখো বাবু! আমার নিজেরও একটা মন আছে। সেই মনে চাওয়া-পাওয়ার মতন কিছু একটা আছে। তোমাকে ভালোবাসব– এ কথা আমি কোনোদিন চিন্তাও করিনি। তাছাড়া আমাকে বিয়ে করার মতো কী এমন যোগ্যতা আছে তোমার? আমি তো তোমার মধ্যে কোনো যোগ্যতাই দেখি না। বাড়ি গিয়ে সানকিতে পানি নিয়ে নিজের চেহারাটা ভালো করে একবার দেখে নিও। কোনো সুন্দরী মেয়ের ভালোবাসা পাবার উপযুক্ত কি না তুমি। আশা করি, এরপর আর কোনোদিন আমার সামনে আসবে না।'

কথাগুলো নিতান্ত অভিনয়ের ছলে বলা হলেও পরি আপুর দু'চোখে অশ্রুবন্যা বয়ে গেল। সেই অশ্রু ঢাকবার জন্য তিনি শাড়ির আঁচলে মুখ লুকালেন।

পরি আপুর নির্মম কথাগুলো শুনে বাবু ভাই যেন পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে গেলেন। পরি আপুদের বাড়ি থেকে তিনি

ভগ্নহৃদয় নিয়ে বেরিয়ে এলেন। সেদিন রাতে তার আর খাওয়াদাওয়া হলো না। কাফনাবৃত লাশের মতো উপুড় হয়ে বিছানায় পড়ে রইলেন। সারারাত কেঁদে সকালে চোখ দুটো ডাহুক পাখির চোখের ন্যায় লাল করে ফেললেন। আজ খুব ভোরে বিছানা ছাড়লেন বাবু ভাই। কাকপক্ষিও তখন জাগেনি। বিছানা ছেড়ে তিনি চলে গেলেন পুরানো একটা কবরস্থানে। কী যেন কী ভেবে কয়েক ঘণ্টা তিনি সেখানকার মাটিতে শুয়ে গড়াগড়ি খেলেন। তারপর ফিরে এলেন পরি আপুর স্মৃতি বিজড়িত সেই ছোট্ট নদীটির তীরে। একা একা তিনি সেখানে কিছুসময় ঘুরে বেড়ালেন। সারাদিন বাড়ি ফেরা হলো না তার। বাড়িতে সকলেই তার অনুপস্থিতি টের পেলেন। দিন গিয়ে রাত নামল। কিন্তু তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

সেদিন রাতে আকাশে পূর্ণিমা চাঁদ ছিল। জ্যোৎস্নাধারায় স্নান সেরে আত্মভোলার মতো রাত সোয়া দুটোয় বাবু ভাই বাড়ি ফিরলেন। চাচিমা তখনো জেগেছিলেন। 'কোথায় গিয়েছিল? কী হয়েছে? কেন খেতে আসেনি?' ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন করেও যখন কোনো জবাব মিলেনি, চাচিমা তখন বাবু ভাইয়ের মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে একবার তাকালেন। শুকনো মুখে অস্পষ্ট কণ্ঠে বাবু ভাই শুধু বললেন, 'ভাত খাব। ভাত দাও।'

খাওয়া সেরে মৌনভাবেই বাবু ভাই বিছানায় চলে গেলেন। চাচিমা বাবু ভাইয়ের মাঝে কেমন যেন একটা পরিবর্তন লক্ষ করলেন। কেন যে তার এরূপ পরিবর্তন– বুঝতে পারলেন না তিনি।

বিছানায় শুয়ে বাবু ভাই এপাশ-ওপাশ করেন। কিছুই যেন তার ভালো লাগছে না। পরি আপুর সেদিনের কথাগুলো নিয়ে তিনি গভীরভাবে ভাবতে লাগলেন। বিড়বিড় করে আপনমনে বলতে থাকেন, 'হায় পরি! তুমি এত নিষ্ঠুর হলে কেমন করে! কীভাবে তুমি এমন কঠিন কথাগুলো বলতে পারলে পরি? না- বললে কি পারতে না?' ইত্যাদি আরও অনেক কথা।

শুক্রবার দিন যথাযথই পরি আপুর বিয়েটা সম্পন্ন হয়ে গেল। সেদিনই বাবু ভাইদের বাড়ির সামনে দিয়ে সানাই বাজিয়ে পরি আপু শ্বশুরবাড়ি চলে গেলেন। সানাইয়ের করুণ সুর বাবু ভাইয়ের হৃদয়ে যেন বেদনার ঝংকার তুলল। সেদিন রাতে বাবু ভাই কিছুসময় পর পর মূর্ছা গেলেন। প্রলাপ বকলেন। প্রলাপ বকে বকেই একসময় তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

মাঝরাতে হঠাৎ হাউমাউ করে চিৎকার দিয়ে জেগে উঠলেন বাবু ভাই। বাড়ির সবাই এসে তার চারপাশে জমা হলো। সকলেই জানতে চাইলেন, কী হয়েছে। কেনইবা তিনি চিৎকার দিয়ে জেগে উঠলেন। কোনো দুঃস্বপ্ন দেখেছেন কি না।

বাবু ভাই অস্পষ্ট কণ্ঠে শুধু বললেন, 'একটা পরি এসেছিল আমার কাছে। পরিটা আমাকে ছেড়ে চলে গেছে।'

কথাটা বলে আবার তিনি অচেতন হয়ে পড়লেন।

তারপর আবারও একটা ঘুম দিলেন বাবু ভাই। ধরাধরি করে তাকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হলো। সেদিন রাত আনুমানিক তিনটের দিকে আবার জেগে উঠলেন তিনি। জেগে 'পরি'! 'পরি'! বলে বিকট চিৎকার দিয়ে উঠলেন।

বাড়ির সকলে আবারও তার কাছে এসে জমা হলো। সকলেই ভাবতে লাগল, ব্যাপার কী! বার বার সে শুধু পরির কথা বলছে কেন? পরির তো আজ বিয়ে হয়ে গেছে। তবে কী পরির সাথে তার কোনো সম্পর্ক-টম্পর্ক ছিল? রহস্যময় ব্যাপার।

সে সময় দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বাবু ভাই সহসা বলে উঠেন, 'ওই তো পরি আসছে। কী সুন্দর লাল শাড়ি পরে সে আসছে! তোমরা ওর দিকে একবার তাকিয়ে দেখো না। আমার কাছেই তো আসছে পরি। আমি তাকে ভালোবাসি কি না!'

তারপর আকাশ ফাটানো একটা অট্টহাসিতে সবকিছু গুলিয়ে ফেললেন বাবু ভাই। খানিক পরই আবার একটা ঘুম দিলেন তিনি। সে এক গভীর ঘুম। সেই রাতে বাড়িতে কারও চোখে আর ঘুম এলো না। বাবু ভাইকে ঘিরে সবাই বসে রইলেন। পরি আপুর সঙ্গে বাবু ভাইয়ের গোপন সম্পর্কের ইতিবৃত্ত কারও আর বুঝতে বাকি রইল না। কিন্তু এখন যে-কিছুই করার নেই। সময় অনেক দেরি হয়ে গেছে। এখন শুধু অনুতপ্ত হয়ে অনুশোচনা করার পালা।

নিয়মের চাকায় ঘুরে একসময় ভোর হলো। প্রভাত পাখির কিচিরমিচির গান শোনা গেল। বাবু ভাইয়ের চোখেমুখে উদীয়মান সূর্যের রক্তমাখা রঙিন আভা ছড়িয়ে পড়ল। 'পরি' নামটি মুখে নিয়েই তিনি জেগে উঠলেন। তারপর ভয়ংকর একটা অট্টহাসি দিলেন। 'হা-হা-হা। পরি! আমার পরি! আমার সাধের পরি! হো হো হো।'

সকালবেলা বাবু ভাইকে নিয়ে সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। প্রাণবন্ত মেধাবী ছেলেটার এমন অবস্থা দেখে চাচা ও চাচিমা কেমন যেন ভেঙে পড়লেন। বাবু ভাইকে নিয়ে বড়ো ডাক্তারের কাছে যাওয়া হলো। তখনো খানিক পর পর তিনি ভীষণ হাসি হেসে শুধু পরি আপুর নামই জপছিলেন। সাথে বেসুরো গলায় দু-একটা গানের কলিও আওড়াতেন।

কয়েকদিন পর বাবু ভাইকে দেখে চেনার উপায় রইল না। মনে হলো পাগল হয়ে গেছেন তিনি। সেই আগের বাবু ভাইয়ের সাথে এখনকার বাবু ভাইয়ের যেন কোনো মিল নেই। ডাক্তার সাহেব তার রিপোর্ট দেখে বললেন, 'মাইণ্ড স্ট্রোক! দেশের বাইরে নিয়ে না-গেলে সুচিকিৎসা সম্ভব নয়।'

চাচার অসচ্ছলতার জন্য বাবু ভাইকে সুচিকিৎসার জন্য আর বিদেশে পাঠানো সম্ভব হলো না। বাবু ভাই এখনো তেমনি করে হাসেন। পরিচিত কোনো গানের কলি বেসুরো গলায় আওড়ান। যদিও 'পরি' নামটা এখন আর তার মুখে শোনা যায় না। সারাদিন গুনগুন গান গেয়ে আর উচ্চৈঃস্বরে হেসে তার সময় কাটে। বাবু ভাই যখন হাসতে শুরু করেন, তখন মনে হয় তার মনে বুঝি কোনো দুঃখবোধ নেই। যেন একজন সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষ তিনি। হাসতে হাসতে একেবারে দু'চোখ বের করে দিতেন। এভাবেই যেতে থাকে দিন।

বছর পাঁচেক পরের কথা। হঠাৎ একদিন শোনা গেল– বাবু ভাই নাকি সুস্থ হয়ে গেছেন। খবর পেয়ে দূর-দূরান্ত থেকে আত্মীয়স্বজন তাকে দেখতে এলো। বাবু ভাইয়ের সেই সুস্থতা অবশ্য বেশি সময় ছিল না। মাত্র কয়েক ঘণ্টা। সে সময় কেউ একজন বলল, 'পরি ওকে দেখতে এসেছে।'

'পরি' নামটা শোনামাত্রই হঠাৎ বাবু ভাইয়ের যেন কী হয়ে গেল। তার মুখখানা কেমন বাঁকা হয়ে গেল। কাত হয়ে তিনি ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন। সকলে ভাবল– আবারও হয়ত তার স্ট্রোকই হয়েছে! মাথায় কিছুসময় জল ঢালার পর তিনি একটু স্বাভাবিক হলেন। তখন পরি আপু তার ছোট্ট মেয়ে টিনাকে সঙ্গে নিয়ে অশ্রুভেজা চোখে বাবু ভাইয়ের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

———— ○ ————

ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ ২০২৫' উপদেষ্টা পরিষদে অনুমোদন

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় তেজগাঁওয়ে গত ৯ই অক্টোবর উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে 'ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ ২০২৫' অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তিগত উপাত্তের গোপনীয়তা, নিরাপত্তা ও দায়িত্বশীল ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে 'ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ ২০২৫' প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। ডিজিটাল যুগে নাগরিকের ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তির ন্যায্য ব্যবহার এবং উদ্ভাবনের জন্য নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজনে এ অধ্যাদেশটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। প্রস্তাবিত আইনটি কার্যকর হলে ব্যক্তিগত উপাত্তের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, স্থানান্তর ও বিনষ্টকরণে আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত হবে এবং ডিজিটাল অর্থনীতির টেকসই বিকাশে এটি সহায়ক হবে।

'ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ ২০২৫'-এর উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ হলো—মোট ৫৭টি ধারা সংবলিত এ অধ্যাদেশে ব্যক্তিগত উপাত্তের মালিকানা স্বয়ং উপাত্তধারীর হাতে থাকবে। উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে উপাত্তধারীর সম্মতি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। শিশু বা সম্মতি দিতে অক্ষম ব্যক্তির উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণে পিতামাতা বা আইনগত অভিভাবকের অনুমতি প্রয়োজন হবে। উপাত্তধারী যে-কোনো সময় তার সম্মতি প্রত্যাহার করতে পারবেন। সংবেদনশীল ব্যক্তিগত উপাত্ত শর্তসাপেক্ষে প্রক্রিয়াকরণের বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়া, জাতীয় নিরাপত্তা, জনস্বার্থ, অপরাধ প্রতিরোধ, শিক্ষা ও গবেষণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রয়োজনে সম্মতি ব্যতিরেকে উপাত্ত ব্যবহারের সুযোগ রাখা হয়েছে। সরকার ব্যক্তিগত উপাত্তকে ৪টি শ্রেণিতে বিভাজন করেছে— উন্মুক্ত, অভ্যন্তরীণ, গোপনীয় ও সীমাবদ্ধ। অধ্যাদেশের বিধান লঙ্ঘন, অননুমোদিত প্রবেশ বা অপব্যবহারের ক্ষেত্রে দণ্ড ও প্রশাসনিক জরিমানা আরোপের বিধান রাখা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ে স্বতন্ত্র উপাত্ত নিরীক্ষক কর্তৃক উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের অডিট সম্পাদনের বিধান রাখা হয়েছে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক উপাত্ত বিনিময় ও সংযুক্তির সুযোগ রাখা হয়েছে।

প্রতিবেদন: শ্রেয়সী শ্যামা

রক্তের বাঁধন

আসাদুজ্জামান খান মুকুল

গ্রামের শেষ প্রান্তে ছোট্ট একটি ছনের ঘর। সামনে ধানক্ষেতগুলো যেন সবুজের এক সমুদ্র। ভোরে কুয়াশা কাটলে ধানের মাঠটা সোনালি আলোয় ঝিলমিল করত। দূরে পাখিদের কিচিরমিচির। এমন পরিবেশে রাশেদ আর মনিরা বেড়ে উঠেছে।

তাদের শৈশব ছিল হাসিখুশি আর দারিদ্র্যের এক অদ্ভুত মিশেল। খুনসুটিতে কাটত অনেকটা সময়। স্কুল থেকে ফেরার পথে 'কে আগে পৌঁছায়' বলে দৌড় প্রতিযোগিতায় নামত তারা। খেলার মাঠে মনিরা হোঁচট খেলে রাশেদের বাড়িয়ে দেওয়া হাতটি সবসময়ের ভরসা ছিল। বিকেলের নরম রোদে গুড়-মুড়ি খেতে খেতে কত যে গল্প করে যেত।

সংসারের অবস্থা ভালো ছিল না। বাবা অসুস্থতা নিয়ে গম্ভীর মুখে কাজ করতেন আর মা মানুষের কাঁথা সেলাইয়ের কাজ করতেন। রাশেদের পড়াশোনায় আগ্রহ ছিল প্রবল। শিক্ষকরা বলতেন, 'এই ছেলেটার হাত ভালো, সুযোগ পেলে কিছু একটা করবে।' কিন্তু সেই সুযোগ আর এলো না। অষ্টম শ্রেণি শেষ হওয়ার

আগেই বাবার শরীর বেশি খারাপ হওয়ায় সংসারের দায়িত্ব তার কাঁধে পড়ল। পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে দিনমজুরি করা ছাড়া উপায় ছিল না।

একদিন মনিরা যখন জানতে পারল রাশেদ আর পড়বে না, তার বুকটা ভেঙে গিয়েছিল। সে চোখ মুছতে মুছতে বলল,

– ভাইয়া, পড়া ছেড়ে দিবি নাকি? তুই তো সবার সেরা ছিলি।

রাশেদ হেসে উত্তর দিলো,

– আমার পড়া না হলে কিছু হবে না। তুই পড়বি। আমি খেটে হলেও তোকে পড়াব।

কথাটা বলার সময় তার চোখে যে শূন্যতার ভাব, সেটা মনিরার চোখ এড়ালো না। নিজের অপূর্ণ স্বপ্নের কথা সে মুখে আনেনি।

শৈশবের পরপরই রাশেদের জীবনে এক অপ্রত্যাশিত সুযোগ আসে। শহরের এক আত্মীয় তাকে গ্যারেজে কাজ দেওয়ার প্রস্তাব দেয়। সেখানে সে শুধু কাজই পেত না, বরং তার কারিগরি দক্ষতা বিকাশের সুযোগ পেত। রাশেদ সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলো। সে জানত, সে চলে গেলে অসুস্থ বাবা এবং মায়ের কাছে মনিরা একা হয়ে যাবে। সে তার নিজের স্বপ্নের বদলে পরিবারের সুরক্ষার দায়িত্ব বেছে নেয়।

সময় গড়িয়ে মনিরা বড়ো হলো। সে সব পরীক্ষায় ভালো ফল করত। রাশেদ রাতে তার পাশে কুপি জ্বালিয়ে পড়াতো। মাঝে মাঝে সে কাজে এতটাই ক্লান্ত থাকত যে চোখ বুজে আসত। কিন্তু মনিরার দিকে তাকালেই সব ক্লান্তি দূর হয়ে যেত। নিজের জন্য নতুন জামা না কিনে পকেটে জমানো টাকা দিয়ে বোনের জন্য বই কিনে আনত।

এসএসসি পরীক্ষার সময় ঘরে একেবারে টানাটানি। চাল, মশলা ফুরিয়ে গেছে, বাবার ওষুধ কেনার টাকা নেই। মনিরার চোখে ভয়। সে দেখল, রাশেদ কেমন অস্থির হয়ে আছে। এক রাতে সে দেখল, রাশেদ একটি পুরানো টিনের কৌটা নিয়ে বাবার কাছে বসে আছে। তার মনে হলো, কিছু একটা ঠিক নেই। পরদিন শুনল, তাদের সামান্য জমিটুকু বিক্রি হয়ে গেছে। সেই টাকা থেকে মনিরার পড়াশোনা, বাবার চিকিৎসা এবং সংসার চলছিল। টাকা ফুরিয়ে গেলে রাশেদ স্থানীয় একটি গ্যারেজে দিন-রাত কাজ করা শুরু করল।

কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস। এক রাতে রাশেদের গ্যারেজে আগুন লাগে। তার সব জমানো টাকা ছাই হয়ে যায়। সে নিজেও মারাত্মকভাবে আহত হয়। আগুনে পোড়া গ্যারেজের ধ্বংসস্তূপে পড়ে যখন যন্ত্রণায় ছটফট করছিল, তার চোখের সামনে শুধু মনিরার মুখ ভাসছিল। সে নিজেকে বলছিল,

– আমি যদি বেঁচে থাকি, মনিরাকে পড়াতে পারব।

সেই এক চিলতে আশা তাকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনল।

মনিরা যখন রাশেদের দুর্ঘটনার খবর পেল, সে এতটাই স্তব্ধ হয়ে গেল যে কিছুক্ষণ কোনো কথা বলতে পারল না। হাসপাতালে ব্যান্ডেজে মোড়া ভাইকে দেখে তার ঠোঁট কাঁপছিল।

– ভাইয়া, আমি আর পড়ব না।

সে ফিসফিস করে বলল,

– তুমি এত কষ্ট করছ, আমি কী করে পড়ব?

রাশেদ ক্ষীণ স্বরে হাসল। ব্যান্ডেজে মোড়া হাতটা কাঁপছিল, কিন্তু বোনের হাত শক্ত করে চেপে ধরল। বলল,

– আমার এই কষ্ট কিছু না, যদি তুই তোর স্বপ্ন পূরণ করতে পারিস। তুই পড়বি, এই আমার শেষ কথা।

মনিরার চোখে জল থাকলেও তার মনে এক অদম্য শক্তি এলো। সে রাশেদের অপূর্ণ স্বপ্নকে নিজের করে নিলো।

মনিরা শুধু পড়াশোনা শেষ করে শহরে একটি ভালো চাকরি পেল। কিছু বছর পর পরিশ্রমে জমানো অর্থ আর দাতা সংস্থার সহায়তায় সে গ্রামে ফিরে স্কুল প্রতিষ্ঠা করল। স্কুলের নাম রাখল, 'রাশেদ স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয়'।

সেই স্কুলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মনিরা মঞ্চে দাঁড়িয়ে রাশেদের ত্যাগের কথা বলল। কীভাবে তার ভাই নিজের সব স্বপ্ন বিসর্জন দিয়ে তাকে মানুষ করেছে, কীভাবে সেই আগুন আর দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করে চলছে। রাশেদ সেদিন অনুষ্ঠানে বসে বোনের দিকে দেখছিল, তার চোখ জলে ভরা, কিন্তু মুখে প্রশান্তির হাসি।

বছরের পর বছর কেটে গেছে। ঈদ বা কোনো উৎসবে যখনই তাদের দেখা হয়, শৈশবের গল্পে ফিরে যায়। কুয়াশা ভেজা ভোর, ধানের মাঠ, বৃষ্টিতে খেলা, গাছতলায় হাসাহাসি, পুকুরে সাঁতার– সব যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে।

শত প্রতিকূলতা, শত দুঃখ-দুর্দশার মাঝেও তারা কখনো আলাদা হয়নি। সুখ-দুঃখের প্রতিটি মুহূর্তে ভাইবোন একে অপরের পাশে থেকেছে।

এক বিকেলে তারা সেই একই শৈশবের মাঠে বসে সূর্যাস্ত দেখছিল। রাশেদ বলল,

– মনে আছে, ছোটোবেলায় আমরা এখানে বসে গুড়-মুড়ি খেতাম?

মনিরা হেসে বলল,

– হ্যাঁ, আর তুই সবসময় আমার ঝামেলা সামলাতি।

তারা অনেক স্মৃতির ভেতর ডুব দিলো। সূর্যটা নামছিল মাঠের ধারে। তারপর দুজনেই চুপ করে বসে রইল অনেকক্ষণ। এই নীরবতার ভেতরেই যেন অনুভব করছিল– এর নামই রক্তের বাঁধন, যা কখনো ভাঙার নয়।

একদিন তার চোখে

কামাল বারি

হেমন্ত-শিশির জমে আছে– তার চোখে বিস্ময়!
চোখে ঠান্ডা রোদ মেখে দূর থেকে শুধু দেখে গেছে–
কথা হয়নি কোনও– ওই বয়ে যায় অন্য নদী;
নবান্ন শস্যের ঘ্রাণ তার কাছেই শিখেছি আমি...

তার ওই অপরূপ হাসিমুখ মগ্ন করে যায়...
রেখে যায় অদ্ভুত নিবিষ্টতার অশেষ– ঋতুতে
অপার মোহময়তা– সুরেলা রোদ কপালে তার–
অনিবার মুগ্ধতার অবকাশ দিয়েছে আমার...

মত্ত পৃথিবীর এই আলো– এই গুচ্ছ চারুলতা–
নীলে, অয়ি নক্ষত্রেরা যত আনন্দবিভায় জ্বলে
তারচে অধিক লীলা এই গ্রহের বিস্ময়কর
আয়োজন!– জেগে থাকে রক্তে মাংসে সামুদ্র লাবণ্য;

উপকূলে শতরূপা আলোর খেলায় মাতোয়ারা–
প্রাণীর শরীর শস্যে শিষে উপচে থাকে মাটিতে–
জীবনের ঘ্রাণে বুঁদ– চোখ মুদে থাকে কেউ কেউ;
সুগভীর প্রেরণার সুধারস শস্যে ঘাসে জমে আছে;
রং নিয়ে মাটিতে জমে উদ্‌গত জীবনের সংগীত–
একদিন তার চোখে হেমন্তশস্য রং ছড়িয়েছে।

নিরুদ্দেশের পথে স্বপ্ন

আবুল কালাম তালুকদার

ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে সুখের পরিধি
দুঃখের সাঁকোতে জীবনের চলাচল
অন্ধকার বর্ষাতে ভিজে যাচ্ছে রাত
ভোরের রোদের মতো তোমার হাসিতে ভরে না মন
বসত ঘরে অবলীলায় ঢুকে যাচ্ছে অন্যায়-অপরাধ
ভালোবাসার প্রতিদিনের বাড়ছে নিষ্ঠুরতা।

ছায়ার পৃথিবীতে রোদ ও মেঘের আদিখ্যেতায়
নিঃশব্দের কাছে হেরে যাচ্ছে জীবনের দিন
দীর্ঘ হচ্ছে প্রতীক্ষার বেসাতি
মেঘ ভাঙা বৃষ্টিতে বাড়ছে বিরহের আর্তনাদ
না পাওয়ার জল জমা চোখে
নিরুদ্দেশের পথে স্বপ্নের আনাগোনা।

হেমন্তের রংতুলি

মুহাম্মদ নূর ইসলাম

ধান কাটা হলো শুরু, পাকা পাকা ধান
মাঠে মাঠে শুনি তাই কৃষকের গান,
পাকা ধান ঘরে এলে মন নাচে সুখে
হাসি ফোটে খোকা-খুকি কৃষানির মুখে।

উঠোনে ধানের আজ শুধু ছড়াছড়ি
আয় খোকা আয় খুকি ছড়াখানি পড়ি,
বুলবুলি ধান খেয়ে গেয়ে ওঠে গান
ঝকঝক করে রোদে পুরো আসমান।

ঘাসফুল ফুটে ওঠে শিশিরের স্পর্শে
বোনাবুনি হয় শুরু গম ডাল সর্ষে,
সকালটা ঢাকা থাকে কুয়াশার চাদরে
রোদ দেখে কুয়াশা বলে ওঠে ভাগো রে!

ভেগে যায় কুয়াশা তাই শিশিরের দল
সোনা রোদ গায়ে মেখে করে ঝলমল,
ভোরে দেখি পুকুরের জলে ওঠে ধোঁয়া
তোমাদের সৌভাগ্য হয়েছে তা ছোঁয়া?

মাঠে মাঠে বাতাসে ধান খেলে ঢেউ
প্রকৃতির এই রূপ দেখেছো কী কেউ?
খোকা বলে খুকি বলে দেখেছি দেখেছি
এই দেখো রংতুলি দিয়ে ছবি এঁকেছি।

হেমন্তের চিঠি

সাবরিন সুলতানা

চিঠি এনেছে হেমন্ত,
কালি দিয়ে নয়, শিশির বিন্দুতে লেখা
তার প্রতিটি অক্ষর।
এ এক আশ্চর্য নিরাসক্তি–
সবকিছু ছেড়ে দেওয়ার সহজ পাঠ।
সে লিখেছে– যৌবনের তীব্র কোলাহল,
অভিমানেরও দিনশেষে আসে নীরবতা।
বুঝে নিতে হয়– পরিপূর্ণতা মানেই
শূন্যতার পানে যাত্রা।
তবু কুয়াশার চাদর সরিয়ে
এক চিলতে রোদ যেন বলে যায়,
শেষ মানেই হেরে যাওয়া নয়।

হেমন্ত এলো

শাহানাজ শিউলী

কে এঁকেছে মায়ার কাজল
কে দিয়েছে রঙিন সাজ?
কে সাজালো শিউলি ফুলে
কার্তিকের এই নবসাজ।

কে পরালো চুলের খোঁপায়
নরম রোদের মিষ্টি ফুল?
কে আনলো শিশিরভেজা
ধানের শিষের কানের দুল।

কে ভেজালো নিহির দিয়ে
আলতা পরা দু'চরণ?
কে আনলো শীতল বাতাস
কুয়াশা ঢাকা এই আবরণ।

কে ছড়ালো নলেন গুড়ের
চারদিকে মিষ্টি সুবাস,
কে উঠালো ফসল ঘরে
নবান্ন আর নতুন কাশ।

শূন্য গোলা পূর্ণ করে
ফসলভরা হাসি মুখ,
চাষির চোখে স্বপ্ন এঁকে
হেমন্ত দিলো নতুন সুখ।

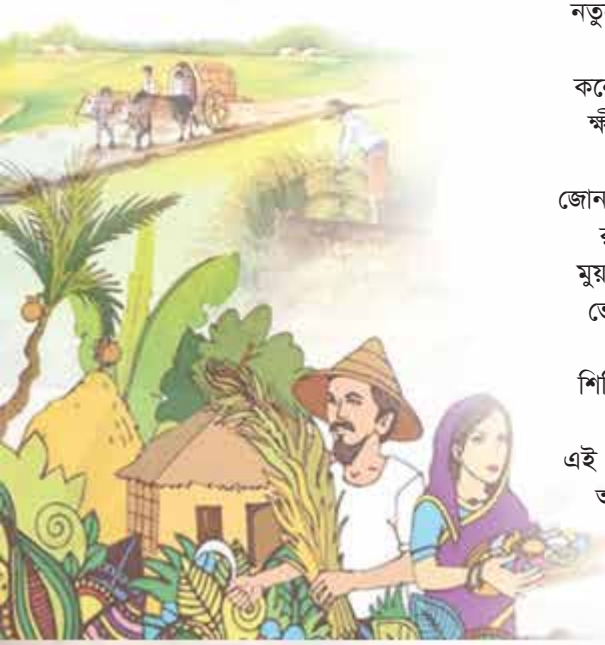

আমায় কেবল টানে

ফরিদ সাইদ

রোদের ঝিলিক মাথার উপর
হঠাৎ আবার ছায়া
এমনি করে খোলা আকাশ
দেখায় দারুণ মায়া।

গাঁয়ের মাঠে সোনালি ধান
কাটছে সবাই মিলে
বাঁচার আশার সম্ভাবনা
জাগছে সবার দিলে।

নতুন ধানের পিঠা-পায়েস
গাঁয়ের বাড়ি-বাড়ি
কনের ঘরে দেয় পাঠিয়ে
ক্ষীর-পায়েসের হাঁড়ি।

জোনাক পোকা জ্বালে আলো
রাতের আকাশজুড়ে
মুয়াজ্জিনের শান্ত আজান
ভোর আকাশে ওড়ে।

শিশিরভেজা স্নিগ্ধ সকাল
মনে সাহস আনে
এই যে সোনার স্বদেশ-ভূমি
আমায় কেবল টানে!

হেমন্তের গান

প্রজীৎ ঘোষ

... তারপর হেমন্তের পড়ন্ত বিকেলে
এক স্বপ্নাতুর মাছরাঙা এসে বলে গেল
এই কার্তিকের রাতে যখন মেঠো চাঁদ খেলা করে
তখন সোনারং ধান দোল খায় পূবালী বাতাসে।

আঁধারের নীরবতা ভেঙে দেয় মোম-জোছনা
দূরের বাঁশবন থেকে ভেসে আসে
ঘুঘুদের সুমধুর ঘু ঘু সুর
মৃত্তিকা হৃদয় আন্দোলিত করে
ঝিঁঝিঁদের মৃন্ময়ী গান।

প্রেমিক হৃদয় হাতড়ে বেড়ায়
প্রিয়ার কাজল চোখ, মেঘকালো চুল
নরম দুটি হাত, মোহনীয় গোলাপি ঠোঁট।
বাউলের একতারায় সুর তুলে
চৈত্রে ভাসা বদ্ধ নদীর স্যাঁতসেঁতে শ্যাওলারা
খেলা করে নবগঙ্গায়।

হৃদয়ানন্দের ফুলঝুরি ছড়িয়ে
এই বাংলার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে
হেমন্তের ধোঁয়া ধোঁয়া কাক ভোরে
উষ্ণ শিশিরের সাথে মিশে যায় জলাঙ্গীর তীর
ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ায় নতুন ধানের পায়েসের ঘ্রাণ।

নবান্নের সোনা রঙা উৎসব

বিপুল চন্দ্র রায়

দিগন্ত-জুড়ে আজ হেমন্তেরই গান,
ক্ষেত-মাঠ ভরে আছে সোনালি ধান।
শিশিরের ছোঁয়া লেগে ঘাসেরা হাসে,
শীতের আগমনি বার্তা বাতাসে ভাসে।

কৃষানির মুখে হাসি, ভরে ওঠে গোলা,
ফসল কাটার গানে মাঠে কৃষকের মেলা।
জামাই-ঝি সব আসে, বাপের বাড়ি মেলা,
সম্পর্কের বাঁধন সে তো হাসি-খুশির ভেলা।

নতুন ধানের চালে ঢেঁকির সুর বাজে,
নবান্নের পিঠা-পায়েস ঘরে-ঘরে সাজে।
বাতাসে ভেসে আসে নতুন চালের গন্ধ,
এই সোনা রঙা উৎসবে জাগে খুশির ছন্দ।

চলে গেলেন ড. কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী

নাজমুন নাহার

সাবেক মুখ্য সচিব, বিশিষ্ট প্রশাসক, অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানী ড. কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী চলে গেলেন না ফেরার দেশে। ৩রা নভেম্বর অতিপ্রত্যুষে কামাল সিদ্দিকী ঢাকার গুলশানে তাঁর বাসভবনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দের ২২শে অক্টোবর কামাল সিদ্দিকী অবিভক্ত ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মেদিনিপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি মার্কসবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। পরবর্তীতে কামাল সিদ্দিকী ১৯৬৮ সালে সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তানে (সিএসপি) যোগদান করেন।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। সে সময় সিদ্দিকী নড়াইলের সাব-ডিভিশনাল অফিসার (এসডিও) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। চাকরি ছেড়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিতে ভারতে চলে যান। পরে ঘোজাডাঙ্গা-সাতক্ষীরা সীমান্তে একটি ক্যাম্পে থেকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সেখানে তিনি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের উপসচিব হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং খুলনা জেলার জেলা প্রশাসক (ডিসি) এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

২০০২ সালের জানুয়ারি থেকে বাংলাদেশ সরকারের শিশু অধিকার সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৪ সাল থেকে স্বাধীন শিশু কমিশনারের অফিসের সাংগঠনিক সেট-আপের পরামর্শ দেওয়ার জন্য জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করেন।

সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব ড. কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী ২০০৬ সাল পর্যন্ত মুখ্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি জাতিসংঘের শিশু অধিকার কমিটির সদস্য হিসেবে ২০০৫ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন থেকে ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজে মাস্টার্স এবং একই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ (SOAS) থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করেন। সাম্প্রতিক সময়ে তিনি অস্ট্রেলিয়ার মোনাশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্যাকাল্টি সদস্য হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

ড. কামাল উদ্দিন সিদ্দিকীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস। এক শোকবার্তায় প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'ড. কামাল সিদ্দিকী ছিলেন প্রশাসন, উন্নয়নচিন্তা ও একাডেমিক গবেষণার এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি ছিলেন একজন সৎ, দূরদর্শী ও নিষ্ঠাবান সরকারি কর্মকর্তা, যিনি দেশের প্রশাসনিক কাঠামোকে আধুনিকায়নের জন্য কাজ করেছেন। একজন মুক্তিযোদ্ধা, গবেষক ও নীতিনির্ধারক হিসেবে তাঁর অবদান জাতি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।' প্রধান উপদেষ্টা মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

অসংখ্য গুণগ্রাহী, পাঠক, সহমুক্তিযোদ্ধাসহ শত শত মানুষ এ জানাজায় অংশগ্রহণ করেন। তাঁকে রাষ্ট্রীয় গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। জানাজার পর তাঁর মরদেহ মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে দাফন করা হয়। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে এগিয়ে আসুন

ডেঙ্গু একটি ভাইরাসজনিত জ্বর যা এডিস মশার মাধ্যমে ছড়ায়। এই মশা সাধারণত ভোরবেলা ও সন্ধ্যার পূর্বে কামড়ায়। সাধারণ চিকিৎসাতেই ডেঙ্গু জ্বর সেরে যায়, তবে ডেঙ্গু শক সিনড্রোম এবং হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর মারাত্মক হতে পারে। বর্ষার সময় সাধারণত এ রোগের প্রকোপ বাড়ে। এডিস মশার বংশ বৃদ্ধি রোধের মাধ্যমে ডেঙ্গু জ্বর প্রতিরোধ করা যায়।

টবে জমে থাকা পানি

পরিত্যক্ত বালতি/গামলায় জমা পানি

এডিস মশার লার্ভা

পিউপা

পরিত্যক্ত টায়ারে জমা পানি

পরিত্যক্ত পাত্র

হেমোরেজিক ডেঙ্গু রোগী

এডিস মশার জীবনচক্র

এডিস মশা ডিম পাড়ার ও বংশ বিস্তারের স্থান

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়:

- আপনার ঘরে এবং আশপাশে যে কোনো জায়গায় পানি জমতে না দেওয়া। ফলে এডিস মশার লার্ভা জন্মাতে পারবে না।
- ব্যবহৃত পাত্রের গায়ে লেগে থাকা মশার ডিম অপসারণে পাত্রটি ব্লিচিং পাউডার দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করতে হবে।
- ফুলের টব, প্লাস্টিকের পাত্র, পরিত্যক্ত টায়ার, প্লাস্টিকের ড্রাম, মাটির পাত্র, বালতি, টিনের কৌটা, ডাবের খোসা/নারিকেলের মালা, কন্টেইনার, মটকা, ব্যাটারি শেল ইত্যাদিতে এডিস মশা ডিম পাড়ে। কাজেই এগুলো বর্জ্য হিসেবে ব্যবস্থা নেওয়া।
- অব্যবহৃত পানির পাত্র ধ্বংস অথবা উল্টে রাখতে হবে যাতে পানি না জমে।
- দিনে অথবা রাতে ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি ব্যবহার করুন।

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 46, No. 05, November 2025, Tk. 25.00

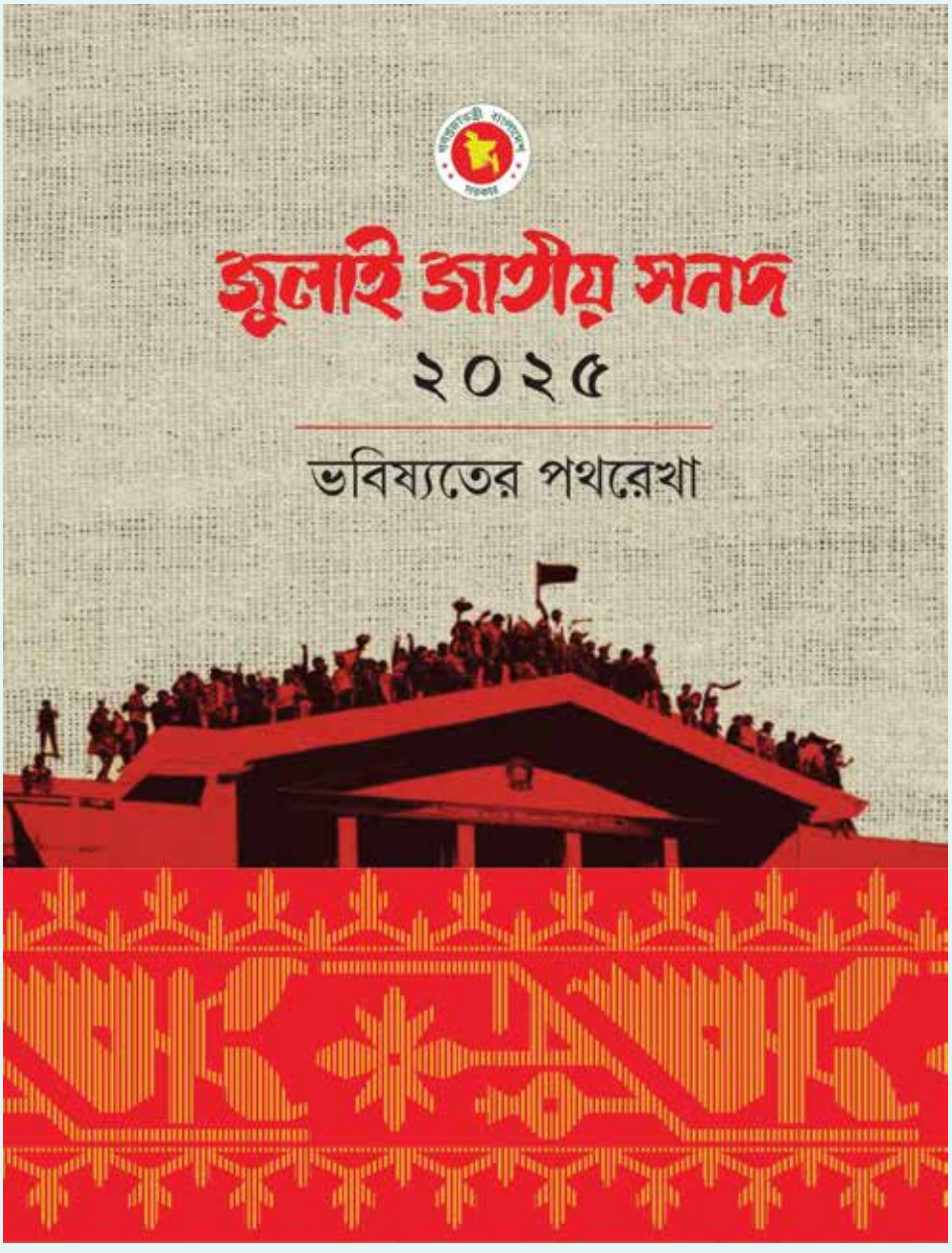

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd